ফ্যান্টাসি ফিকশান

পরী

এজি মাহমুদ

গল্পের পায়ে শেকল পড়িয়ে বেশ বাহবা কুড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার সংজ্ঞার সৎকারে পুড়ে ছোট হয়ে যাওয়া গল্পের সেই 'বনসাই' রূপের চিরমুগ্ধতার রেশ এখনও কাটেনি। তবে সীমানা গড়িয়ে পার হলে চার আর উড়ে গেলেই ছক্কা– এ নিয়ম খাটিয়ে আর যাই হোক গল্পকে বেঁধে রাখা যায় না। কিন্তু সাহিত্যের মাঠে এখনও তর্জনী উঁচু করে আউট দেখানো আম্পায়ার কিংবা অযথা লালকার্ড দেখিয়ে, বাঁশি ফুঁকে খেলা শেষ করে দেওয়ার মত রেফরিদের অভাব নেই। তবে ফ্যান্টাসি ফিকশন যে সেইসব আম্পায়ারের তর্জনী এবং রেফরির লালকার্ডের বিচার বহিঃর্ভূত– সে কথা জানিয়ে রাখছি শুরুতেই।

মাঠের দর্শক এবং বইয়ের পাঠকের চোখের ভূমিকাকে তারা এক করে দেখেন। কিন্তু যে বিষয়টি তার জানেন না বা জানলেও মানেন না তা হলো, দর্শকরা কেবল চোখে দেখে বাস্তবতা আর পাঠকরা পড়ে চোখ দিয়ে; মনে ভাসে উথালপাথাল কল্পনা। আর সেই বিষণ্ন বাস্তবতার বেঁড়াজাল ডিঙিয়ে দুর্নিবার দুরন্ত কল্পনার প্রশ্রয়ের প্রথম প্রয়াস ফ্যান্টাসি ফিকশান গল্পগ্রন্থ– পরী।

অতিনির্মম বাস্তবতায় যেখানে গল্পের চরিত্রগুলো, সম্মুখে মাটির দেয়াল দেখামাত্র পিছু হটে সেখানে ফ্যান্টাসি ফিকশানের চরিত্ররা পাথুরে দেয়াল ভেদ করে অতিপ্রাকৃত অজানাকে স্পর্শ করে যায় অজান্তেই। তাই আপনার জন্যও রইলো একের পর এক পৃষ্ঠা উল্টে সেই বহুমাত্রিক চরিত্রদের পিছু নেওয়ার আমন্ত্রণ!

উৎসর্গ

আসমা রহমান– আমার মা

যিনি অনেক লেখা পড়েন কিন্তু অনেক লেখা লিখেন না !

জন্মদাগ

এক

সন্ধ্যা নামছে। প্রতিদিনের মতই পশ্চিম আকাশটা লালচে আভা ছড়িয়ে আঁধারে ডুবছে। মাথার উপর দিয়ে কখনও কখনও এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের মাঝে কোনো কলরব নেই। নিঃশব্দে পাশের বাড়ির ছাদেও কার্নিশে বসে আছে দাঁড়কাকটাও। আমি কাকটাকে কয়েকবার তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ভয় দেখিয়েছিলাম। কিন্তু সে যায়নি এবং আমার বদ্ধমূল ধারণা কাকটা আমাকে ভয়ও পায়নি। উল্টো মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আমাকেই ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে।

আমি কাকটাকে পাত্তা না দিয়ে অনিমার দিকে তাকালাম। অনিমা ছাদের ওপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে পশ্চিমাকাশের দিকে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে এ কোনো নিরব কান্না বয়ে নিয়ে যাওয়া শবযাত্রার নিঝুম সন্ধ্যা। এক সময় মনে হলো পিছনে কিছু একটা চলে এসেছে। দাঁড়কাকটা নয়তো? ঘুরে তাকিয়ে দেখি অনিমা। আমি চেপে রাখা শ্বাস ফেলে বললাম, 'ওহ, তুমি, আমি ভেবেছিলাম– অন্যকিছু...'

অনিমা হেসে বলল, 'অন্যকিছু আবার কী? আমি ছাড়া অন্য কেউ তোমার কাছাকাছি আসুক এটাই কী তুমি চাও?' আমি অনিমার কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'এরকম সুন্দরী স্ত্রী থাকতে কোনো বোকাও সে চিন্তা করবে না।' অনিমা ওর কাঁধ থেকে আমার হাতটা নামিয়ে দিয়ে ওর দু'হাতে সেটা জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি কি কোনো কারণে বিষণ্ন?'

আমি ভ্রু কুঁচকে বললাম, 'নাহ। একদমই না। কিন্তু এমন কথা কেন মনে হল তোমার?' অনিমা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, 'জানি না। তবে আমাদের সন্তান থাকলে তুমি নিশ্চয়ই বিষণ্ন হওয়ার সময় পেতে না।'

আমি কাধ ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হয়তো। কিন্তু আর কয়েকটা দিন সময় দাও। আরেকটু গুছিয়ে নেই।' অনিমা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এতকিছু আমি বুঝতে চাই না। তুমি আমার একাকীত্ব দূর করে দাও।'

বুঝতে পারলাম, অনিমা রেগে যাচ্ছে। ওর ধাঁচটাই এমন, হঠাৎ করেই রেগে যাবে। আমি অনিমাকে বোঝানোর চেষ্টা করি। পেছনে থেকে ওর হাতটা চেপে ধরে বললাম, 'অনিমা, শোন...' পরমুহূর্তেই অনিমা ঘুওে দাঁড়িয়ে আমার চোখের দিকে তাকল। ও তাকাতেই মনে হলো যেন আমার নিউরনে খচ্ করে কেউ ধারল নখের খামচি বসিয়ে দিয়েছে। এরপরই ' আমার সন্তান কবে পৃথিবীতে আসবে' বলে ও ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে নিল। সাথে সাথেই আমি সিঁড়িঘরের দেয়ালে একরকম উড়ে গিয়ে বাড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমার মনে হলো, কোনো অতিদানবীয় শক্তি আমাকে এক ধাক্কায় কোথাও ছুঁড়ে ফেলেছে। আর অনিমার শেষ কথাটি আমার মাথার ভেতরে একপাশ থেকে অন্যপাশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্ছে। যে কণ্ঠস্বর আমি ওর মুখ থেকে শুনেছি সেটা কি কোনো স্বাভাবিক কণ্ঠ ছিল? সবকিছু কেমন কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। দু'চোখের দৃষ্টি দিয়ে দৃশ্যগুলো মেলাতে কষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এতকিছুর মধ্যেও দেখলাম, দাঁড়কাকটা এতক্ষণে ডানা মেলে শূন্যে উড়াল দিয়েছে। শূন্যে হারিয়ে যাওয়ার আগে মনে হলো কাকটা আমার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি হাসল। সে হাসি এ জগতের নয়, অন্যজগতের। যে জগতের সঙ্গে চেনা জানা এই জগতের কোনো পরিচয় নেই। আচ্ছা একটি স্বাভাবিক কাক কি ওই কাকটির মত কওে সত্যি সত্যি হাসতে পারবে? প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়ার আগেই দেখি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী অনিমা একবুক ভালোবাসা নিয়ে আকুল হয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে।

দুই

কয়েকদিন পর। বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। রাস্তাঘাট এমনিতেই নির্জন। বাস স্ট্যান্ড থেকে আমার বাসার যেটুকো দূরত্ব তাতে করে রিকশা নেওয়াটা বাতুলতা। তাই হেটে হেটে বাড়ি ফিরছি। সেদিনের ঘটনায় খুব লজ্জা পেয়েছে অনিমা। বেচারিতো ভয়েই অস্থির। এরকম কেন হয়েছিল আমরা দু'জনের কেউ তা বুঝতে পারিনি। অনিমা জোর করে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিল। আমি রাজি হইনি। বাসার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি তখন দেখি এক বৃদ্ধা ঠিক আমার মুখোমুখি এগিয়ে আসছে। নিশ্চিত ভিক্ষা চাইবে। এতরাতে একজন অসহায় ভিখারীকে ফেরানো ঠিক হবে না ভেবে পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ স্পর্শ করতেই জমে গেলাম। মানিব্যাগের সঙ্গে পকেটে হাত আটকে গেছে। পকেট থেকে মানিব্যাগও বের হচ্ছে না, হাতও ছুটছে না। বৃদ্ধা ধীর পায়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী ভিক্ষা দেবে না, দাও ভিক্ষা দাও।'

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমার হাত যে পকেটে আটকে গেছে এটা এই বৃদ্ধা জানে। ওহ্ আল্লাহ! কে এই মহিলা!

বৃদ্ধার মাথায় বেশ বড় করে ঘোমটা দেওয়া। সাদা শাড়ি ঢিলেভাবে অষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচানো, তাই শারীরিক কাঠামোটাও স্পষ্ট নয়। তবে মাহিলা লম্বায় বেশি উঁচু নয়। এ কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা উচ্চতায় আমাকে অন্তত একহাত ছাড়িয়ে গেল। আমি তখনও আনমনেই মানিব্যাগটা পকেট থেকে বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। বৃদ্ধা তখনই যেন তার কণ্ঠস্বরের চাবুক বাতাসে বসিয়ে বলল, 'থামো। অযথা টানাটানি করো না । ওটা ছুটবে না। বাইরের খোলস দেখে যারা মানুষ চেনার চেষ্টা করে কিংবা মানুষ সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা করে তাদের এমনটাই হওয়া উচিত।'

আমি বিস্মিত গলায় বললাম, 'কে আপনি?'

বৃদ্ধা মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা তোমার জানার প্রয়োজন নেই।' খেয়াল করলাম হঠাৎ বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরও বেশ আর্দ্র হয়ে গেছে। অনেকটা যেন আমার মায়ের মত শোনাচ্ছে। ' এই জগত খুব স্বাভাবিক আবার খুব অস্বাভাবিকও। তাই বাইরের রূপ দেকে বোঝা যায় না কে সাধক কিংবা কে অবতার অথবা ভিক্ষুক! তেমনি বোঝা যায় না কে পিশাচ আর কে অশুভ অস্তিত্ব! মানুষের বেশে এরা তোমার আশেপাশেই ঘুরছে। তাদেরকে চেনার চেষ্টা কর।' আমি অসহায়ের মত বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কীভাবে?' সেই সময়েই তীব্র আলোর ঝলকানি আর হর্নের শব্দে চমকে গেলাম। তাকিয়ে দেখি একটি প্রাইভেট কার হেডলাইট জ্বেলে বারবার হর্ন দিয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কখন যে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়েছি সে একদমই খেয়াল করতে পারিনি। আমি সরে দাঁড়িয়ে সাইড দিতেই গাড়িটা বেড়িয়ে গেল। বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে আমি আবারও চমকে গেলাম। হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে ছুটে চলা তরল রক্তের স্রোত যেন এক সেকেন্ডের জন্য জমাট বেঁধে গেল। বৃদ্ধা কেন, পুরো রাস্তা জুড়েই কেউ নেই। রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে আরেকদফা ধাক্কা খেলাম। আমি বাস থেকে নেমেছি সাড়ে দশটার কিছু আগে। তাহলে গত এক ঘন্টা ধরে আমি কি অন্ধকার রাস্তা ধরেই হেটে বেড়াচ্ছি!

তিন

আবারও সেই অদ্ভুত সন্ধ্যা। এবার এক বিশাল বালুময় প্রান্তর। অনিমা সেই প্রান্তরের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা দেখছে। আর আমি ওকে ঘিরে এপাশ ওপাশ হাঁটাহাঁটি করছি। কখনও ওকে ছাড়িয়ে বহুদূর চলে আসছি। আবার কখনও কাছাকাছি কোথাও। এভাবেই কেটে যাচ্ছে সময়। অন্ধকার যখন প্রায় নেমে এসেছে তখন শুনতে পেলাম অনিমার আর্তনাদ। ফিরে দেখি অনিমা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। ওর মাথার ওপরে একখণ্ড কালো মেঘ। চারপাশে মেঘ থেকে নেমে আসা ধোঁয়াশা ওকে ঘিরে ধরেছে। আমি ছুটে ওর কাছে যাওয়ার জন্য পা ফেলতেই দেখি পা সরাতে পারছি না। বালিতে পা দেবে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে এক পা

তুলে পা ফেলতেই বালিতে আরও গভীরে দেবে গেল। অনিমার মাথার ওপরের কালো মেঘের খণ্ড আরও বড় হচ্ছে। বড় হতে হতে আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ। আকাশ থেকে বিজলিগুলো এমনভাবে ছুটে আসছে যে মনে হচ্ছে যে কোনো সময় মাথা ছুঁয়ে দেবে। এরমধ্যে তাকিয়ে দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই বৃদ্ধা।

প্রচণ্ড বজ্রপাতের মধ্য দিয়েও ভেসে এল তার কণ্ঠস্বর, 'সে আসতে চাইছে তোমার রক্ত নিয়ে এই পৃথিবীতে। তুমি তাকে আসতে দিও না।' আমি হাহাকার করে বললাম, 'আপনি অনিমাকে বাঁচান। ও মারা যাচ্ছে।' তাকিয়ে দেখি অনিমাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ও ধোঁয়াশার মধ্যে পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। বৃদ্ধা আমার কথা বোধহয় শুনতেই পেলেন না। আমার মাথাও এখন বালিতে দেবে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তেও বৃদ্ধা বলতে লাগল, 'তুমি তাকে আসতে দিও না।'

শ্বাস টানতে না পেরে আমার স্বপ্নটা ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে দেখি আমার সারা শরীর ঘামে ভিজে জবজব করছে। বাথরুমে গিয়ে মুখে পানির ঝাপটা মারলাম কতক্ষণ। এরপর ফ্রিজ খুলে ঢকঢক করে পানি খেলাম কয়েক গ্লাস। বিছানায় ফিরে দেখি অনিমা প্রতিমার মত আভা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। এতরাতে ওকে আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে হলো না। কিন্তু বাকি রাতটা আমি আর ঘুমুতে পারিনি। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটিয়েছি।

চার

দেড়টার মত বাজে। সময়টা দুপুরবেলা। অফিসের সবাই মোটামুটি লাঞ্চে চলে গেছে। কেবল আমি যেতে পারিনি। যেত ইচ্ছা করছে না। অফিসের কাজেও মন বসে না। গত কয়েকরাত ধরে আমি একই স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নের পরপরই ঘুম ভেঙে যায়। বাকি রাত আর ঘুম হয় না। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। অনিমা বোধহয় এখনও কিছু টের পায়নি।

'কীরে দোস্ত, তোর এ কী অবস্থা?' আচমকা প্রশ্নে চমকে তাকাই আমি। ইদানিং মানসিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়েছি। সামান্য শব্দ হলেই চমকে যাই। মাহবুবকে সামনে দেখে মনে হলো কিছুটা মানসিক শক্তি পেলাম। আমি হেসে বললাম, 'কী রে তুই কোত্থেকে?'

মাহবুব বলল, 'দেখি তোর সেলফোনটা দে, আমার নাম্বারটা কী আছে নাকি ডিলিট করে দিয়েছিস?' আমি হেসে বললাম, 'চল খেতে যাই। আমি এখনও দুপুরে খাইনি।'

খাওয়া শেস করে মাহবুব একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া ছেঁড়ে মাহবুব বলল– ' পরপর কয়েকদিন একই স্বপ্ন দেখছিস। ব্যাপারটা তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। চল এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি।' আমি ভেবেছিলাম, মাহবুব বুঝি আমাকে কোনো পীর-ফকিরের কাছে নিয়ে যাবে। গিয়ে দেখি নিয়ে এসেছে এক ভদ্রলোকের কাছে। ভদ্রলোক মধ্যবয়স্ক। সাইকোলজির প্রফেসর, নাম ইমতিয়াজ চৌধুরী। প্রথমে আমি ঠিক করেছিলাম কাউকে কিছুই বলব না। এই ভদ্রলোক এসব শুনে হাসাহাসি করবেন– সেটা দেখে আমার মেজাজ আরও খারাপ হবে। শেষপর্যন্ত মাহবুবের কারণে সব বলতে হলো। ভদ্রলোক আমার কথা শুনে মোটেও হাসেননি বরং মনে হলো কথাগুলো তিনি মনোযোগ দিয়েই শুনেছেন। ইমতিয়াজ চৌধুরী কথা বলেন কম। আমার কথা শেষ হওয়ার পর ইমতিয়াজ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার স্ত্রীকে এসব ঘটনার কথা আপনি বলেছেন?' আমি বললাম, 'না বলিনি।' তিনি বললেন, 'দ্যাটস গুড। আপাতত কিছু বলার দরকার নেই। আপনি আপনার বাসার ঠিকানাটা আমাকে দিন।' আমি ভদ্রলোককে ঠিকানা দিয়ে মাহবুবকে নিয়ে চলে আসলাম। মনে হচ্ছিল যেন বুকের মাঝে জমে থাকা আটকে পড়া নিঃশ্বাসগুলো বেড়িয়ে আসছে। নিজেকে এতটা ভারমুক্ত আর কখনও মনে হয়নি আমার।

পাঁচ

সেদিন রাতে ঘুমিয়েছি। দুঃস্বপ্ন তখনও আমার দেখা শুরু হয়নি। তার আগেই কী কারণে যেন আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই দেখি অনিমা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কী হয়েছে তোমার? ঘুম আসছে না?' বলেই আমি বুঝতে পারলাম অনিমার কোনো সমস্যা হয়েছে। আনিমা আমার টি-শার্ট খামচে ধরে আমার মুখটা ওর মুখের কাছে নিয়ে বলল, 'আমার সন্তান কবে পৃথিবীতে আসবে?' ওর মুখের ওর কণ্ঠস্বরের অভিব্যাক্তি আমার হৃৎপিণ্ডকে একটানে যেন শরীর থেকে বের করে নিয়ে আসছিল। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কারণ ও কিছুতেই অনিমা হতে পারে না। এ অন্য কেউ। যার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই। এ সময় মনে হলো বহুদূর থেকে গুঞ্জণ ভেসে আসছে। একটু একটু করে শব্দটা এগিয়ে আসছে। আরেকটু এগিয়ে আসতেই আমি বুঝতে পারলাম এটা ল্যান্ডফোনের রিং বাজার আওয়াজ। এই আওয়াজটাতে মনে হলো অনিমা খানিকটা বিরক্ত। আমাকে ছেড়ে দিয়ে রিসিভার উঠিয়ে বলল, 'রং নাম্বার।' তারপর খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চাদর টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি বিছানা ছেড়ে বারান্দায় বসে থেকে বাকি রাতটা পার করে দিলাম। সারা রাত জুড়ে একটি প্রশ্নই ঘুরেফিরে আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল– এভাবে আমি আর ঠিক কতদিন বেঁচে থাকতে পারব?

ছয়

তিনদিন পর। সকালবেলা অফিস যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বের হয়েছি। শুরু হলো গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। আকাশ অবশ্য ভোররাত থেকেই মেঘলা ছিল। কিন্তু তখন বৃষ্টি পড়েনি। আমি বাসা থেকে বের হতেই বৃষ্টি। সারারাত্রি এমনিতেই ঘুম হয়নি। গত কয়েক রাতে আমি ঘুমুতেই পারিনি। ঘুমুতে গেলেই কেমন এক আতঙ্ক এসে আমাকে চেপে ধরে। কোনো রকমে ঝিমিয়ে রাত কাটাচ্ছি। এ সময় আবার বেজে উঠলো সেলফোন। এত সকালে কে ফোন করে! একরাশ বিরক্তি নিয়ে ফোন হাতে নিতেই দেখি ইমতিয়াজ চৌধুরীর ফোন। ফোনটা রিসিব খরতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল, 'হ্যালো, ইমতিয়াজ চৌধুরী বলছিলাম। আহাদ সাহেব বলছেন?' আমি একটা দোকানের শেডের নীচে দাঁড়িয়ে বললাম, 'জ্বী বলছিলাম।' ইমতিয়াজ চৌধুরী বললেন, 'আপনি এখনই আমার বাসায় চলে আসুন, প্লীজ। ইটস আর্জেন্ট।' আমি ওপাশে তার কণ্ঠ শুনেই বুঝতে পারলাম কোনো কারণে তিনি খুব উত্তেজিত। তিনি কি তাহলে কিছু ধরতে পেরেছেন? আমি ফোনে আর কথা বাড়ালাম না। সেলফোনটা পকেটে রেখে হাত বাড়িয়ে হাক ছাড়লাম, 'ট্যাক্সি...'

ইমতিয়াজ চৌধুরীর বাসায় ঢুকে দেখি তিনি সিগারেটের ধোঁয়ায় পুরো ঘর ভর্তি করে রেখেছেন। আমি ড্রইংরুমে বসতেই তিনি বললেন, 'সরি, আপনি তো আবার স্মোকিং করেন না।' আমি বললাম, 'নো ইটস অলরাইট। বলুন, কী ব্যাপার?' ইমতিয়াজ চৌধুরী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। তবে বিষয়টি জানা জরুরী তাই জিজ্ঞাসা করা– আপনার স্ত্রী কি প্রেগন্যান্ট?' ইমতিয়াজ সাহেব অ্যাশট্রতে আধপোড়া সিগারেটে ফেলে পুরো স্টোনহেঞ্জ বানিয়ে বসে আছেন। আমি সে দিকে তাকিয়ে বললাম, ' না, তবে ও চাচ্ছে।' ইমতিয়াজ চৌধুরী চোখ থেকে চশমা খুলে একপাশে রেখে বললেন, ' আমি আপনার বাসায় গিয়েছিলাম। আপনার ওয়াইফ এ ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেছে?' আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না, ও কিছু বলেনি। আপনি কবে গিয়েছিলেন?'

ইমতিয়াজ চৌধুরী বললেন, 'গতকাল দুপুরে। আপনি তখন অফিসে ছিলেন।' মনের মধ্যে কোথায় যেন ঈর্ষার খোঁচা অনুভব করলাম। অনিমা আমাকে বিষয়টি জানায়নি কেন? ও কি তাহলে নিজেকে আড়াল করে রাখছে? তারপরেও নিজেকে প্রবোধ দিলাম, হয়তো– বলতে ভুলে গেছে। ইমতিয়াজ চৌধুরী ভ্রু নাচিয়ে বললেন, 'কী ভাবছেন?'

আমি বললাম, নাহ! কিছু না। কেমন দেখলেন আমার স্ত্রীকে?'

ইমতিয়াজ চৌধুরী একটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে লাগলেন, 'কোনো জীব বা প্রাণীর অস্তিত্বকে যদি স্থুলভাবে ভাগ করা হয় তাহলে দুটো সাইড পাওয়া যাবে। এর একটা হচ্ছে জীবন বা আত্মা। আরেকটি হলো– দেহ বা শরীর। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রতিটি প্রাণীর জন্ম বা উৎপত্তির মধ্য দিয়েই এ দুটো ফ্যাক্ট একসঙ্গে কম্বিনেট হয়ে আসছে। প্রকৃতি এভাবেই নিয়ম করে রেখেছে। নিয়মানুযায়ী, আত্মা ছাড়া দেহ মূল্যহীন এবং দেহ ছাড়াও আত্মা ক্রিয়াশীল নয়। এ দুটো সিস্টেম যুগ যুগ ধরেই প্রকৃতি কনস্ট্যান্ট রেখেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথম ধাপে কোনো ব্যাতিক্রম না ঘটলেও দ্বিতীয় ধাপে বা সিস্টেমে কোনো এক অজানা কারণে প্রকৃতি সেখানে ব্যাতিক্রম টেনে রেখেছে। অর্থাৎ দেহ ছাড়াও কখনও কখনও আত্মার ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত প্রকৃতির কোনো এক্সপেরিমেন্টের ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল এগুলো। সৃষ্টির শুরুতেই এরা তাদের সেকেন্ড এলিমেন্টসটা পায়নি। প্রকৃতি তাদের দেহ বা কাঠামো কখনই তৈরি করেনি। কোনো এক বিচিত্র কারণে প্রকৃতির কাছে এরা অবহেলিত। ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালরা তাদের প্রতি প্রকৃতির এই অবহেলা মেনে নিয়েছে। কিন্তু সবাই নয়। তাদের কিছু অংশ সেকেন্ড এলিমেন্টস পাওয়ার জন্য আগ্রহী। আর মানুষ যুগে যুগে এই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে।

মানুষ স্বাভাবিক ক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষ সবসময়ই অস্বাভাবিক অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী হতে চেয়েছে। প্রকৃতি মানুষকে সেই সুযোগও করে দিয়েছে। ব্ল্যাক ম্যাজিকের মাধ্যমে নিজের আত্মা শয়তানের কাছে বিক্রি করে অথবা নিজের দেহকে কোনো অশুভ অস্তিত্বের কাছে বিলিয়ে দিয়ে অস্বাভাবিক ক্ষমতাশীল হয়েছে কিছু নীচ-ঘৃণ্য প্রকৃতির মানুষ। সময়ের বিবর্তনে মানুষ এখন এমনিতেই টেকনোলজির খাতিরে অনেক বেশি ক্ষমতাবান। তাই ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রয়োজনীয়তাও প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আর ব্ল্যাক আর্টিস্ট বা ব্ল্যাক ম্যাজেশিয়ানরাও ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু সেই অশুভ অস্তিত্ব, আত্মা বা শক্তি যাই বলুন না কেন তারা এখনও ধ্বংস হয়নি কিংবা সেকেন্ড এলিমেন্টস পাওয়ার আকাঙ্খা এতটুকু কমেনি। সেরকম এক অশুভ অস্তিত্ব বাসা বেঁধেছে আপনার স্ত্রীর মাঝে।'

ইমতিয়াজ চৌধুরীর কথাগুলো কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকল আমার কাছে। অনিমার দেহে বাসা বেঁধেছে অশুভ অস্তিত্ব– অসম্ভব! সাইকোলজির প্রফেসররা কিছুটা পাগলাতে হয়, কিন্তু ইমতিয়াজের পুরো মাথাটাই সম্ভবত গেছে। না কোনো শিক্ষিত মানুষ এভাবে গ্রমের ঝাড়ফুঁক টাইপ ফকিরদের মত করে কথা বলে? আমি ইমতিয়াজ চৌধুরীর পুরো বুজরুকিটাই হজম করে বললাম, 'এত লোক থাকতে আমার ওয়াইফ কেন? আপনি নিশ্চয়ই এখন বলবেন যে, অনিমা– এক বিশাল ভয়ংকর ব্ল্যাক আর্টিস্ট কিংবা ডাইনী!' ইমতিয়াজ চৌধুরী বুঝতে পারলেন না যে, আমি রেগে যাচ্ছি। তিনি শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'পুল ডাউন, ম্যান। না , আমি সে কথা আপনাকে বলব না। এ ব্যপারটা প্রথমদিকে আমাকে ভাবিয়েছিল। কিন্তু পরে আপনার স্ত্রীকে দেখার পর বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। আপনার স্ত্রীর হাতে একটা সাইন আছে না?'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, ওটা ওর জন্মদাগ।'

ইমতিয়াজ চৌধুরী বললেন, 'হু, সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি। কিন্তু প্রাচীনকালে ব্ল্যাক আর্টিস্টরা পৈশাচিক কিংবা অশুভ অস্তিত্বকে নিজের দেহে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নিজেদের শরীরে কিছু সাইন বা চিহ্ন আঁকত। এই চিহ্নগুলো হচ্ছে একরকম প্রবেশপথ। হোক সেক পিশাচ কিংবা অন্যকিছু কিন্তু দরজা বা প্রবেশপথ না থাকলে তো সে কিছুতেই ভেতরে আসতে পারবে না। তাই নির্দিষ্ট কিছু চিহ্নের মাধ্যমে সেই প্রবেশপথরূপী সাইনগুলো মানুষের মানুষের দেহে আঁকা হত। দুর্ভাগ্যক্রমে সেরকম একটি সাইনের সঙ্গে আপনার স্ত্রীর জন্মদাগটির হুবহু মিল রয়েছে। ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রয়োজন কমে যাওয়ায় অশুভ অস্তিত্বরা মানুষের দেহে প্রবেশের তেমন কোনো সুযোগ পায় না। কিন্তু আপনার স্ত্রীর জন্মদাগ অশুভ আত্মাদের জন্য সেই সুযোগ নিয়ে এসেছে। আর এমনি করেই আপনার স্ত্রীর দেহে বাসা বেঁধেছে কোনো এক অশুভ অস্তিত্ব।

প্রত্যেক অস্তিত্বই তার বিকাশ সাধন করতে চায়। প্রজননের মাধ্যমে নিজের স্বত্তাকে, নিজের স্থায়িত্বের ভিতকে মজবুত করতে চায়। এসব ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালরাও এর বাইরে নয়। সেকেন্ড এলিমেন্টস পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন সে তার সন্তানকে কম্বিনেট করে পৃথিবীতে আনতে চাইছে। এখন এই অবস্থায় আপনার স্ত্রীর সন্ত ান হলে সে হবে প্রেত সন্তান। সেই শিশুটির দেহটি হবে মানুষের কিন্তু আত্মা হবে স্বয়ং সেই অশুভ প্রেতের। ফলে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালদের মত সেই শিশুটিকে দেহ বা কাঠামো খুঁজে বেড়াতে হবে না। নিজস্ব কাঠামো নিয়েই সে হয়ে উঠবে ভয়ংকর অশুভ ক্ষমতার অধিকারী। আর এ কারণেই সেই প্রেত আপনার স্ত্রীকে দিয়ে দ্রুত সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে প্রলুব্ধ করছে।

ইমতিয়াজ চৌধুরীর কথা শুনে আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই কল্পনা বলে মনে হলো। এও কী বাস্তব হতে পারে! আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'একজন এডুকেটেড পারসন হয়ে আপনি আমাকে যেসব গল্প শোনাচ্ছেন তা শোনার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। সরি, মিস্টার ইমতিয়াজ।'

আমার কথায় ইমতিয়াজ চৌধুরীর কোনো ভাবান্তর হলো না। তিনি শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, ' দেরি করলে ব্যাপারটা আরও ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে আপনার ওয়াইফকে কাজে লাগাতে না পারলে সেটা আপনার মাঝেও ঢুকে পড়তে পারে।' আমি এবার তার কথায় বিস্মিত না হয়ে পারলাম না, 'কেন আমার শরীরেও কি ব্ল্যাক সাইন রয়েছে নাকি?' ইমতিয়াজ চৌধুরী গম্ভীর গলায় বললেন, 'না নেই। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে দিয়ে আপনার শরীরে ব্ল্যাক সাইন এঁকে নেওয়া সেই প্রেতের পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়।' আমি এই পাগলের সঙ্গে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এলাম।

সাত

ইমতিয়াজ চৌধুরীর বাড়ি থেকে চলে আসার পর ভেবেছিলাম অনিমাকে ভালো কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হয়নি। অনিমা এমনিতেই খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সন্তান নিয়ে তার মাছে আর কোনো অস্বাভাবিকতাই আমি আর লক্ষ করিনি। ইদানিং রাতে আমার ঘুমও ভালো হচ্ছে।

হঠাৎ একদিন ভোররাতে স্বপ্নে দেখলাম, সেই রহস্যময় বুড়ি অনিমাকে শক্ত করে রশি দিয়ে বাঁধছে। অনিমা ভয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করছে আর এদিকে ইমতিয়াজ চৌধুরী আমাকে আটকে রেখে জ্ঞান দিচ্ছেন। কিছুতেই অনিমার কাছে যেতে দিচ্ছেন না। এরকম একটা বাজে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। সেলফোন অন করে দেখলাম, সাড়ে পাঁচটার মত বাজে। বুঝলাম, আর ঘুম হবে না। অনিমা ঘুমুচ্ছে। ইমতিয়াজ চৌধুরীর গালগপ্পো শুনে অনিমাকে আমি কী করে অবিশ্বাস করি? কলেজ লাইফ থেকে অনিমার সঙ্গে আমার পরিচয়। দুজনে খুব ভালো বন্ধু ছিলাম। ভার্সিটি লাইফ শেষে দু'জনেই সিদ্ধান্ত নিলাম বিয়ে করার। বিয়ের পর আমাদের সাড়ে তিন বছর পার হয়ে গেছে। একটা পথ একসাথে হাঁটতে গিয়ে যে আমি অনিমার মাঝে ভালো ছাড়া কোনোদিনই বাজে কিছু খুঁজে পাইনি আর কোথাকার কোন ইমতিয়াজ চৌধুরীরর কথায় আজ...।

এসব ভাবতে ভাবতেই বাথরুমে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম আমি। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি জমে গেছে। শেভ করা দরকার। শরীরে একটা আড়মোড়া ভেঙে যেই শেভিং কিটটা নিতে যাব তখন মনে হলো, পিঠের চামড়ায় কীসের যেন টান লাগছে। চট করে টিশার্ট খুলে পিঠ আয়নার দিকে রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। এ কী বাস্তব, নাকি কোনো দুঃস্বপ্ন! টিশার্ট ছুঁড়ে ফেলে সেলফোনটা খুঁজতে ছুটলাম আমি। এখনই ইমতিয়াজ চৌধুরীকে ফোন করতে হবে।

আট

ইমতিয়াজ চৌধুরী আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'একদম উত্তেজিত হবেন না মিস্টার আহাদ। এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আর ভয়ংকর কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই যে আপনি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন

এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমার ওপর ভরসা রাখুন। তবে আমি এক্ষেত্রে মোটেও প্রফেশনাল নই। পুরো ব্যাপারটা শিখেছিলাম শখের বশে। কতটুকু করতে পারব জানি না। তবে আমি সাধ্যমত আপনার স্ত্রীর জন্য চেষ্টা করব।

মাহবুব বলল, 'আর কিছুর কি দরকার হবে, প্রফেসর ইমতিয়াজ?'

ইমতিয়াজ চৌধুরী বললেন, 'হবে। পুরো ব্যাপারটাই যে কোনো মুহূর্তে সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠতে পারে। আপনার কাজ হবে সেই সময় মিস্টার আহাদকে সামাল দেওয়া।'

মাহবুব প্রফেসরের কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দরকার পড়লে ওকে পিটিয়ে শুইয়ে দেব তারপরেও কোনো ঝামেলা করতে দেব না।' মাহবুবের কথা শুনে হেসে ফেললাম আমি। কতদিন আগে যে আমি শেষ হাসি হেসেছিলাম মনে করতে পারলাম না। ইমতিয়াজ চৌধুরী তার ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বললেন, 'চলুন যাওয়া যাক।'

নয়

পরিকল্পনা অনুযায়ী, অনিমাকে কিছুই বুঝতে দেওয়া যাবে না। অনিমা যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে বসে ব্যাপারটা কঠিন হয়ে যাবে। আমি ঠিক অফিস টাইমের হিসাব অনুযায়ী বাড়ি ফিরলাম। আজ সকালে বাথরুমে গিয়ে আমার পিঠে অনিমার হাতের সেই চিহ্নটা মত হুবহু ব্ল্যাক ম্যাজিকের সাইন খুঁজে পেয়ে আমি আর ইমতিয়াজ চৌধুরীর কথা অবিশ্বাস করতে পারিনি। তবে সাইনটি পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি। কিছুটা অংশ বাকি রয়ে গেছে। পুরো সাইনটি আমার পিঠে আঁকা হয়ে গেলে কী হত বলা যায় না। আমার সাইনটি অবশ্য নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এবার নষ্ট করতে হবে অনিমার ব্ল্যাক সাইনটা। চিরতরে ধ্বংস করে দিতে হবে ওই প্রবেশপথ। যাতে আর কখনও কোনো অশুভ অস্তিত্ব দখল করে নিতে না পারে আমার অনিমাকে। বাড়ি ফিরে দেখি অনিমা কী একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। আমাকে কাছে আসতে দেখে ম্যাগাজিন রেখে চোখ পাকাল অনিমা, 'অ্যাই, এখন একদম কাছে আসবে না। যাও আগে ফ্রেশ হও– তারপর।'

আমি শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে দুষ্টু হাসি হেসে বললাম, 'তোমার শর্ত মেনে নেব যদি গরম এক কাপ কফি খাওয়াতে পারো। না হলে কিন্তু...'

অনিমা ম্যাগাজিন রেখে কিচেনের দিকে ছুটল। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে প্রার্থনা করলাম, 'হে প্রভু, আমাদের এই সুখের দিনগুলোকে তুমি হারিয়ে যেতে দিও না।'

কফি এনে আমার হাতে কাপ ধরিয়ে দিল অনিমা। আমি কাপে চুমুক দিতে দিতে বারান্দায় চলে এলাম। তারপর অনিমাকে ডাকলাম। ম্যাগাজিন হাতে অনিমা ছুটে এল। আমি বললাম, 'তুমি এ কী কফি বানিয়েছ? মনে হচ্ছে স্রেফ গরম শরবত।'

অনিমা রেগে গিয়ে বলল, 'ছিঃ আমি গরম শরবত বানাই! কই দেখি– দেখি' বলেই আমার হাত থেকে নিয়ে কফির কাপে চুমুক দিতেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়ে গেল আমার কোলে। আমি চেপে রাখা শ্বাসটা ছেড়ে দিলাম। যাক পরিকল্পনার প্রথম অংশ যথাযথভাবে হয়েছে। প্রফেসর ইমতিয়াজের দেওয়া লিকুইড ড্রপের একফোঁটা অনিমা বারান্দায় আসার আগ মুহূর্তে ঠিক মতই কফির কাপে ফেলতে পেরেছি।

মাহবুব আর আমি অনিমাকে ধরাধরি করে ছাদে নিয়ে এলাম। ইমতিয়াজ তার তুকতাক নিয়ে রেডি। অনিমাকে মেঝেতে শুইয়ে দিতে বললেন। ওকে মেঝেতে ফেলে রাখতে খারাপ লাগছিল তাই নীচ থেকে আমার প্রিয় ইজি চেয়ারটা চট করে নিয়ে এসে ওকে সেখানে বসিয়ে দিলাম।

ইমতিয়াজ চৌধুরী তার কাজ শুরু করে দিলেন। প্রথমেই অনিমার কোমরে শক্ত করে লাইলনের রশি বাঁধা হলো। তারপর পিছমোড়া করে বেঁধে দেওয়ার হল হাতদুটো। ওভাবেই ওকে রেখে দিলাম চেয়ারে। তারপর সেই চেয়ারকে ঘিরে পাঁচটা স্টোন দিয়ে প্রফেসর ইমতিয়াজ পেন্টাকল তৈরি করতে শুরু করলেন। পেন্টাকল হলো অশুভ আত্মাদের হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য তৈরি চক্র। এই চক্র তৈরি করতে আগে প্রয়োজন হত– নতুন পাঁচটা ঘোড়ার নাল, পাঁচটা রুপার পেয়ালা, পাঁচটা সাদা মোমবাতি। সাদা চকের সাহায্যে দুটো বৃত্ত আঁকতে হয়। আড়াআড়ি প্রায় সাতফুট মাপের ছোট বৃত্তটি স্পর্শ করে থাকবে পাঁচ মাথাওয়ালা একটি তারাকে। তারা বা স্টারটিকে তৈরি করতে হয় পাঁচটি মোম ব্যবহার করে আর মূল দুটির বৃত্তের মাঝে আঁকতে হয় রাশিচক্রের বিভিন্ন চিহ্ন। রূপার পেয়ালগুলো পূর্ণ রাখতে হয় পবিত্র পানি দিয়ে। এসবই প্রফেসর ইমতিয়াজ আমাকে বলেছেন। তবে তিনি ঘোড়ার নালের জায়গায় ব্যবহার করেছেন বিশেষ পাঁচটা স্টোন। তাতে করে অনেক ঝামেলাই কমে গেছে। প্রফেসর যে কৌশল এঁটেছেন সেটা হলো, পেন্টাকলে যেহেতু কোনো অশুভ আত্মা ঢুকতে পারে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই পেন্টাকলের ভেতরে থাকলে সেটা নিশ্চয়ই বের হতে পারবে না। অশুভ আত্মাকে পেন্টাকলের ভেতরে রেখে আমরা অনিমাকে টেনে বের করে আনব। অনেকটা ছাঁকনি দিয়ে ছেকে ফেলার মত। তারপর অনিমার হাতের ব্ল্যাক সাইনটা ড্যামেজ করে দেওয়া হবে। পেন্টাকল তৈরি কাজ প্রায় শেষ। অনিমাকে কফির সঙ্গে আমি যা খাইয়েছি তার হিসেব অনুযায়ী অনিমার ঘুম ভাঙতে আর মাত্র মিনিট পাঁচেক সময় আছে। এরপরই অনিমা জেগে উঠবে। তার সঙ্গে সঙ্গে ওর মাঝে বাসা বেঁধে থাকা পিশাচটাও।

ইমতিয়াজ চৌধুরী খানিকটা পিছিয়ে আমার আর মাহবুবের পাশে এসে দাঁড়ালেন। অনিমার শরীর কাঁপছে। সময় হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল আমার। ওদিকে আকাশটাও আজ ক্রমশ সাজছে ঘন কালো মেষ দিয়ে। একরত্তি বাতাস নেই। এসময় চোখ মেলে তাকল অনিমা।

নিজেকে এরকম অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে গেল ও। অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার সামনে আমাকে বেঁধে রেখেছে। আর তুমি চুপ করে আছ? তোমার অনিমাকে তুমি এভাবে কষ্ট দিতে পারলে?'

আমি ওর কথা শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। ছুটে যাচ্ছিলাম ওর দিকে। এ সময় মাহবুব শক্ত করে আমাকে চেপে ধরল।

ইমতিয়াজ চৌধুরী শান্ত গলায় বললেন, 'তোমার কোনো ভয় নেই, অনিমা। তুমি উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে চলে এসো।' অনিমা কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, 'হাত
বেঁধে রেখেছ কেন? খুব ব্যথা পাচ্ছি!' আমি মাহবুবের ওপর জোর খাটিয়ে ওর বাঁধন ছোটাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। প্রফেসর এ সময় একটি কাঁচের বোতলে রাখা পানি অনিমার দিকে ছিটিয়ে দিতেই যেন অনিমার ভঙ্গি বদলে গেল। ঝট করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মুহূর্তেই। অনিমার এমন রূপ বদলে যেতে দেখে আমি স্থির হয়ে গেলাম। মাহবুবও অবাক। স্বাভাবিক রয়েছেন কেবল প্রফেসর ইমতিয়াজ। অনিমার চোখ দুটো জ্বলজ্বলে দুটো অগ্নিকুণ্ড বদলে গেল। শক্ত করে বাঁধা নাইলনের রশি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। হাতদুটো মুক্ত হয়ে গেল ওর। পেন্টাকলের সোজা ওপরে বরাবর আকাশে জমা হয়েছে জমাট কালো মেঘ। ঠিক আমার দেখা সেই দুঃস্বপ্নের মত। প্রফেসর ইমতিয়াজ অনিমার কোমরে বেঁধে রাখা রশির এ প্রান্ত ধরে আচমকা টান দিলেন। মনে হলো অনিমা ছিটকে এসে অদৃশ্য কোনো দেয়ালে ধাক্কা খেল। ঘোর কাটিয়ে আমি আর আর মাহবুবও রশির প্রান্ত চেপে ধরলাম। পেন্টাকলের চারপাশ ধোঁয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে। প্রফেসর

নীল বোতল থেকে আরও কিছু হলি ওয়াটার অনিমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গগনবিদারী অপার্থিব চিৎকারে যেন পৃথিবীটা কেঁপে গেল। পরমুহূর্তেই অনিমার হাতের নখগুলো স্যাঁত করে বড় হয়ে গেল। ধারাল এক পোঁচে নাইলনের রশি দুটুকরো হয়ে গেল। আনন্দে হেসে উঠলো অনিমা। না, অনিমা নয়, ওর ভেতর ঘাঁটি গেড়ে থাকা অপার্থিব অশুভ জীবটা। হাসির শব্দে যেন ডেকে উঠল হাজার খানেক নেকড়ে। তীব্র সাইরেনের মত সেই আওয়াজ। হাসির সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল জীবটার কালচে লাল আঁকাবাকা ধারাল দাঁত। দেখে গা গুলিয়ে এল আমার। এদিকে জীবটা তো নাইলনের রশি কেটে দিয়েছে। অনিমাকে পেন্টাকল থেকে টেনে বের করব কীভাবে? এই পেন্টাকল বেশিক্ষণ আর ওই জীবটাকে আটকে রাখতে পারবে না। এসময় সেই অশুভ অস্তিত্বটি চোখের পলকে ইজি চেয়ারটিকে লাথি মেরে আমাদের দিকে পাঠিয়ে দিল। ইজি চেয়ারটি প্রচণ্ড আঘাতে শতশত টুকরো হয়ে আমাদের দিকে ছিটকে এল। আমি মাটিতে ঝট করে মাথা নামিয়ে নিলাম। আমার পাশে থ্যাঁচ করে শব্দ হতেই তাকিয়ে দেখি, 'একটা লম্বা কাঠের টুকরোর অর্ধেকটা ইমতিয়াজ চৌধুরীর হাঁটুর ওপরে গেঁথে গেছে।

আমি বুঝলাম খেলা প্রায় শেষ। তাই অস্তিত্ব রক্ষায় শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। আমার অনিমাকে আর যাই হোক, একটা পিশাচের হাতে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়া ছাড়ব না। ছাদের কিনারে পড়ে থাকা মাঝারি আকৃতির বাঁশটা তুলে নিলাম। বাঁশটা সামনের দিকে বাড়িয়ে সোজা অনিমার পিছন দিক দিয়ে ছুটে গেলাম। পাশ থেকে মাহবুব; ইমতিয়াজ চৌধুরীর হলি ওয়াটারের বোতল থেকে পানি ছিটিয়ে দিতেই শুরু হল গননবিদারী চিৎকার। ঠিক এসময় অনিমাকে আঘাত করলাম আমি। পেন্টাকল থেকে ছিটকে বেড়িয়ে গেল ও । সঙ্গে সঙ্গে মাহবুবকে প্রফেসরের সাইন রিমুভার লিকুইড লোশন দিয়ে অনিমার দিকে ছুটতে দেখা গেল। আমি ঠিক পেন্টাকলের পাশেই মেঝেতে পড়ে আছি। বাঁশটা পড়ে আছে আমার মাথার সামনে। ওটার যে অংশ দিয়ে অনিমাকে আঘাত করেছি সেটা পুরোটাই ঝলসে কয়লা হয়ে গেছে। ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনও ওটা থেকে। পেন্টাকলের ভেতরে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের একটা কিছুকে মোচড় খেতে দেখা যাচ্ছে। এই কিছুটাই কি সেই অশুভ অস্তিত্ব! ঘৃণ্য জঘন্য শক্তিটা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম আমি। তাকালাম অনিমার দিকে। মাহবুব ওর হাতের সাইনটার ওপর লোশনটা স্প্রে করছে। চামড়া পোড়া গন্ধ ভেসে এল আমার নাকে। অনিমার হাতের ওই জায়গাটার চামড়া পুড়িয়ে সাইনটা নষ্ট করে দিচ্ছে। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ওই অশুভ অস্তিত্বের প্রবেশপথ!

ইমতিয়াজ চৌধুরী এতক্ষণ পড়েছিলেন মেঝেতে। হঠাৎ খুঁড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কী যেন ছুঁড়ে দিলেন পেন্টাকলে। বুঝলাম পেন্টাকল ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। পেন্টাকল ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধূমকেতুর গতিতে অন্ধকার আকাশের দিকে ছুটে চলে গেল অশুভ অস্তিত্ব, যার প্রয়োজনীয়তা প্রকৃতি কখনওই অনুভব করেনি। তার বদলে নীচে নেমে আসতে লাগল অঝোর ধারায় ঝরে পড়া প্রকৃতির পবিত্র স্পর্শ– বৃষ্টি!

কিন্নরী চুড়ি

এক

অতসী একটা প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'নাও ধরো।'

সময়টা দুপুরবেলা। রেস্টুরেন্টে লাঞ্চের পর ঘুরতে বের হব দু'জন। অতসীর খাওয়া প্রায় শেষ। কিন্তু আমি তখনো 'টু বি কন্টিনিউ' ভঙ্গিতে খেয়ে যাচ্ছি। তাই প্যাকেট হাতে না নিয়ে আমার প্লেটের দিকে তাকাতে ইশারা করলাম ওকে।

এবার কৃত্রিম রাগ দেখাল অতসী, 'কি ব্যাপার, তোমার খাওয়া এখনো শেষ হয়নি?'

খেতে খেতে জবাব দিলাম, 'না হয়নি। চাইলে তুমিও আবার শুরু করতে পারো।'

'কোনো মানুষের এতক্ষণ লাগে খাওয়া শেষ করতে?'

'আমি মানুষ– এ কথা তোমাকে কে বলল? আমি তো অমানুষ।'

'একদম ফালতু কথা বলবে না। এসব ফালতু কথা বলে আমাকে রাগানোর চেষ্টা করো তুমি।'

অতসী আর কোনো কথা বলল না। খাওয়া থামিয়ে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মহামান্যা, প্যাক খুলে ভেতরটা দেখতে পারি?'

অতসী জবাব দিল না। কটমটে চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

প্যাকেটটা না খুলে আবার যথাস্থানে নামিয়ে রেখে বললাম, 'সত্যি আপনার পছন্দের তারিফ না করে পারছি না।'

'ফাজলামো কর? প্যাকেটটা না খুলেই বলে দিচ্ছো যে, আমার পছন্দ ভাল?'

'পছন্দ ভাল না হলে কী আর আমার সঙ্গে বসে থাকতে?'

আমার কথা শুনে হেসে ফেলল অতসী। ওর চোখজুড়ে এখন আবার খেলা করছে এক অদ্ভুত মায়ামাখা দৃষ্টি। পরিচয়ের প্রথমদিনেই এই দৃষ্টি যেন আমার মনের দেয়ালে তীরের মতো বিঁধেছিল। এরপর যতবারই দেখা হয়েছে ততবারই সেই তীর যেন একটু একটু করে হৃদয়ের আরও কাছাকাছি, আরও গহীনে প্রবেশ করেছে। এমনি করেই একটা সময় এসে মনে হলো, ওর চোখের বন্ধনে সারাজীবনের জন্য বাঁধা পড়ে গিয়েছি আমি।

দুই

'এ্যাই দেখ না চুড়িগুলো কেমন হয়েছে?' অতসী আজ হাতভর্তি রেশমী চুড়ি পড়ে এসেছে। একটু পরপর সেই চুড়ির 'টিং টাং টুং' টাইপ শব্দ হচ্ছে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা পিয়ানোর মৃদু শব্দের মতো শোনাচ্ছে

সেই শব্দ। আর এমনটা হচ্ছে বলেই হয়তো অতসী আজকে হাতটাও একটু পরপরই নাড়াচ্ছে। এই যেমন এখন অতসী তার চুড়িভর্তি হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বসে আছে।

আমি ওর বাড়িয়ে ধরা হাতটা ধরে বললাম, 'তোমার এই চুড়িসমগ্র বিটোভেন দেখতে পাননি বলেই সিম্ফোনির সিরিয়াল নয় নাম্বারেই আটকে গিয়েছিল। না হলে দশম সিম্ফোনির আগে তাকে থামানোই যেত না।'

'বলেছে তোমাকে।' মনে হলো খানিকটা লজ্জা পেয়েছে অতসী। নিজেকে সামলে নেওয়ার জন্য বলতে শুরু করল, 'জানো, আজকে কিন্নরী চুড়ি কিনতে গিয়েছিলাম। পাইনি। এটা নতুন ডিজাইনের চুড়ি। একসঙ্গে অনেকগুলো পড়া যায় না। একটা করে পড়তে হয়।'

'তুমি কিন্নরী চুড়ি পরে কি করবে? কিন্নরী সংগীত গাইবে নাকি?'

'সবকিছুতেই তোমার ফাজলামো'। হাতটা টেনে সরিয়ে নিতে চাইলো অতসী। আমি ছাড়লাম না।

'ফাজলামো হবে কেন ? আমি জানিতো, চুড়ি-কাজল-টিপ এগুলো তোমার অসম্ভব পছন্দের সাজগোজের যন্ত্রপাতি। ইলেক্ট্রেশিয়ানদের যেমন স্কচটেপ-স্ক্রুডাইভার-প্লায়ার্স।'

অতসী ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে হাটতে শুরু করলো। এতক্ষণ বসে ছিলাম শাহবাগের ছবির হাটে। অতসী এখন টিএসসির দিকে যাচ্ছে। আমিও একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ খানিকটা গ্যাপ রেখে অতসীর পেছন পেছন হাটতে শুরু করলাম। সেটা দেখে অতসী আরও জোরে জোরে হাটতে শুরু করলো। অবশ্য অতসী আমাকে ফেলে রেখে যেতে পারবে না। বেশি এগিয়ে গেলে সে নিজে থেকেই প্রথমে কচ্ছপ তারপর শামুক এরপর শ্লথের গতিতে হাটবে। সিগারেটটা শেষ হতে না হতেই অতসীর হাটার গতি একদম শ্লথে চলে এসেছে। আমি সিগারেটের ফিল্টারটা ছুঁড়ে ফেলে অতসীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

তিন

নিউমার্কেটে সেদিন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলাম অতসীর জন্য। ঘন্টা পার যাচ্ছে– কোনো পাত্তা নেই। ফোনও ধরছে না। এত বিরক্ত লাগছিল। সমস্যা হলে একটা কলও তো করতে পারতো। এভাবে টেনশনে রাখার তো কোনো মানে হয় না! আগে কখনও ও এমন করেনি। তাই টেনশন হচ্ছে আরও বেশি। আমাকে ওয়েট করানোর মতো মেয়ে অতসী নয়। বরং দেরিটা আমারই হয়। কিন্তু আজকে...
আরও আধঘন্টা পর।
সেলফোনের রিং বাজার তিন সেকেন্ডের মাথায় রিসিভ বাটন চেপে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় তুমি?'

'আমি এই যে, এক নাম্বার গেটের সামনে। তুমি কোথায়?', অতসীর কন্ঠ পুরোপুরি স্বাভাবিক।

'আচ্ছা ওখানেই থাক। আমি আসছি।' লাইন কেটে দিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যা বলার মুখোমুখি বলবো।

গেটের সামনে থেকে রিকশায় তুলে নিলাম অতসীকে। কেমন যেন অন্যমনষ্ক মনে হচ্ছে ওকে। ভেবেছিলাম সরি-টরি কিছু বলবে। কিন্তু কোনো কথাই বলছে না একেবারে। শেষপর্যন্ত আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার? এত দেরি করলে যে? এতবার ফোন দিলাম, ধরলে না...'

‘দেরি হতেই পারে। সেটা নিয়ে এতকিছু বলার কি আছে? আর ফোনের রিং আমি খেয়াল করিনি। তোমার কি ধারণা ইচ্ছা করে ফোন রিসিভ করিনি?’

‘আমি কী সেটা বলেছি? আর এ নিয়ে এত রিয়েক্ট করার কিছু নেই।’

‘রিয়েক্ট! হোয়াট ডু ইউ মিন? আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলবে আর আমি সেটা মেনে নেবো! আমাকে কী পেয়েছো তুমি?’

‘তুমি এমন করছো কেন?’, অবাক হয়ে তাকাই ওর দিকে।

অতসীর চোখের পাতা ছোট ছোট করে হিসহিস করে বলল, ‘আমি এমনই, কেন আগে জানতে না বুঝি?’

আমি কোনো কথা বাড়ালাম না। শাহবাগ মোড়ে রিকশা থেকে নেমে মানিব্যাগ বের করলাম। দশ টাকার নোট দেখে মাথা নাড়লো রিকশাওয়ালা। নেবে না। ভাড়া নিয়ে তর্ক বাঁধানোর মত কোনো মানসিকতা কাজ করছিল না তখন। মানিব্যাগ খুলে আরও টাকা বের করতে যাচ্ছিলাম।

এ সময় চড় মারার শব্দে মুখ তুলে দেখি অতসীর হাত রিকশাওয়ালার গাল থেকে সরে আসছে। ‘এ্যাই ব্যাটা ভাড়া বেশি চাস কেন? আগে ডাকাতি করতি নাকি?’

আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। রিকশাওয়ালার চেহারা দেখে মনে হল, বেচারা হাজার ভোল্টের ইলেক্ট্রিক শক খেয়েছে। আশেপাশের মানুষজনও তাকিয়ে আছে এদিকে।

অতসী বিড়বিড় করে আরও কী যেন সব বলে যাচ্ছে। পরিস্থিতি সুবিধার নয়। চারপাশে লোক জমে যাচ্ছে। তাড়াহুরো করে রিকশাওয়ালাকে বিশ টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিয়ে সরে এলাম ওখান থেকে। অতসী যে এমন কখনো করতে পারে সেটা না দেখলে কখনো বিশ্বাসই করতে পারতাম না। অতসী এরকম কখনোই ছিল না। ওর সঙ্গে আমার চার বছরের পরিচয়। কিন্তু...

নাহ! কোথাও বসে মাথা ঠান্ডা করে ভাবা দরকার। নিরিবিলি একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লাম অতসীকে নিয়ে। ওখানে বসতেই অতসী মুখে একরকম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি নিয়ে এসে বলল, ‘এটা কী রকম একটা খ্যাত কালারের শার্ট পরেছ! তোমার রুচি তো দিন দিন ওই রিকশাওয়ালাটার মত হয়ে যাচ্ছে।’

আমি অতসীর কথার জবাব না দিয়ে বললাম, ‘কী খাবে?’

‘ভাত খাব। গরুর মাংস দিয়ে আগুন গরম ভাত। সঙ্গে বেগুন ভর্তা আর ডাল।’

গরুর মাংস খেতে চাচ্ছে অতসী ! এ অসম্ভব! গরু ওর একেবারে অপছন্দ। আর বাইরে ভাত খেতে আমি কখনোই দেখিনি ওকে। বাইরে খাবার বলতে হালকা কিছুই ওর পছন্দ। তবুও কিছুই বললাম না ওকে। বলার মতো পরিস্থিতি নেই এখন। বিষয়টা আসলে কী হচ্ছে সেটা আরও ডিটেইলস বোঝা দরকার।
ওয়েটারকে ডেকে খাবার দিতে বললাম। তবে বেগুনভর্তা হবে না বলে জানাল ওয়েটার। ভেবেছিলাম, এ কথা শুনে খেপে যাবে অতসী। কিন্তু বেগুনশূণ্যতা নিয়ে তেমন কোনো ভাবান্তর আছে বলে মনে হল না।

অতসীকে আজ লাগছেও অন্যরকম। সাধারণত ওর চুলে ক্লিপ থাকে। আজকে নেই। খোলা চুল চারপাশে ছড়িয়ে পরেছে। কপালে টিপ নেই তবে চোখে বেশ গাঢ় করে কাজল দেওয়া। ঠোঁটে লালচে লিপস্টিক। কোনো প্রোগ্রাম ছাড়া অতসী এসবের স্টিক-ফিস্টিকের ধার ধারে না। তাহলে আজ কেন...

ওহ্! ওর বাহাতে একটা অদ্ভুত ডিজাইনের চুড়িও দেখা যাচ্ছে। এটাই মনে হয় সেই বিখ্যাত কিন্নরী চুড়ি। কিন্নরী চুড়ি পড়ে অতসীর মন আরও ভাল থাকার কথা। সেদিন এই চুড়ির কথা বারবার বলছিল। কিন্তু ও এরকম করছে কেন? আচ্ছা, অতসী না হয় আজ একটু অন্যভাবে সেজেছে। তাই বলে মানসিকতা পাল্টে যেতে পারে না।

খানিক পর ওয়েটার খাবার দিয়ে যেতেই খাওয়া শুরু করলো অতসী। একজনের খাবারের কথা বলেছিলাম। আমার খাবার রুচি হচ্ছিল না একদম। আমি না খেলে অতসী খাবারে হাতই দেয় না কখনো। অথচ সেই অতসী আজ আমাকে না বলেই খেতে শুরু করেছে। বুকের ভেতরে কোথাও মনে হচ্ছে দুমড়ে-মুচরে গেল। অতসীর খাবার ভঙ্গি দেখে মনে হলো, অনেকদিন সে কোনো কিছু খায়নি। খেতে খেতেই হঠাৎ কী কারণে যেন থমকে গেল অতসী। ওয়েটারকে ডেকে দিতে বলল আমাকে। ওয়েটার আসতেই ডালের বাটিটা একটানে তুলে ওয়েটারের মুখ বরাবার ছুঁড়ে দিল অতসী। তারপর টেবিলে একটা দড়াম করে একটা ঘুষি বসিয়ে দিয়ে ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে হিসহিস করে বলল, 'তোকে না বেগুন ভর্তা আনতে বলেছিলাম। ওইটা কই? আর এটা কি দিছোস? গাছের ডাল সিদ্ধ করা পানি?'

ভয়াবহ ঝামেলা হয়ে যাচ্ছিল। তবে রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার নেহায়াত ভদ্রলোক বলে রক্ষা। কোনোরকমে তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ওখান থেকে বেড়িয়ে এলাম।

'তোমার কি হয়েছে? এমন করছ কেন?' নিজের কণ্ঠ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে টের পাচ্ছিলাম।

অতসী মুখে আবার সেই তাচ্ছিল্যের হাসিটা ফিরে এল, 'আমি এমনই।'

'এরকম তুমি কখনোই ছিলে না। তুমি বদলে গেছ অতসী। আমি কখনই ভাবিনি তুমি এমন করে বদলে যাবে।'

'এরকম প্যানপ্যানানি মার্কা কথা শুনিয়ো না তো, মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পারলে এসব মেনে নাও। না মানলে চলে যাও।'

'চলে যাও– মানে কী? কোথায় যাবো?'

'গো টু হেল– কথাটার অর্থ বোঝো?'

ওর মুখে এ কথা শোনার পর আমার দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। ভালভাবে তাকিয়ে দেখলাম অতসীকে। সে কী সত্যিই আমার অতসী? নাকি অন্যকেউ? এই কী আমার ভালোবাসার সেই মেয়েটি?
নাহ্– এমন সে ছিল না কখনই। হিসেব মিলছে না কিছুতেই। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

আমি খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'আর তুমি– তুমি কোথায় যাবে?'

অতসী উদাস ভঙ্গিতে বলল, 'এখনও ঠিক করিনি।'

আমি অন্যদিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভালো। ঠিক আছে– যেতে চাইলে যাও। আমি কাউকে জোর করতে চাই না।'

অতসী এবার সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছিল। আমি পেছন থেকে ওর বাম হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো অতসী। তাচ্ছিল্যের হাসিটা উধাও হয়ে গেছে মুখ থেকে। তার বদলে সেখানে ভর করেছে অবর্ণনীয় কোনো এক যন্ত্রণা। কুঁচকে গেছে চোখ মুখ। আমার দিকেও সরাসরি তাকাতে পারছে না সে।

আমি কী খুব শক্ত করে ধরেছি? দ্বিধান্তিত হয়ে খেয়াল করলাম, আমার হাত ওর সেই কিম্ভুতকিমাকার কিন্নরী চুড়ির ওপর গিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কী যেন মনে হলো, সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ওই চুড়ির ওপরে। আরও জোরে চাপ বাড়িয়ে দিয়ে ভেঙ্গে দিলাম চুড়িটাকে। আর তখনই অতসী ঢলে পড়ে গেল আমার হাতের ওপরে।

চার

হাসপাতালের কেবিনে অতসীর হাত ধরে বসে ছিলাম অনেকক্ষণ। তখনও ওর জ্ঞান ফরেনি। ডাক্তার অবশ্য বলে দিয়েছেন, তেমন সিরিয়াস কিছু নয়। নার্ভাস ব্রেকডাউন থেকেও এমনটা হতে পারে। ধরে রাখা হাতে অতসীর স্পর্শ জোড়ালো হতেই বুঝলাম ওর জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু তখনও চোখ খুলেনি অতসী। হাতটাকে আরও শক্ত করে আমার নাম ধরে ফিসফিস করে ডাকলো আমাকে। আমি সাড়া দিতেই ওর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল জল। ফিসফিস করে বললাম, 'কিছু হয়নি তোমার। চোখ খোল।'

অতসী কান্না জড়ানো কণ্ঠে বললো, 'সবকিছু আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল, ওই কিন্নরী চুড়িটা হাতে দেওয়ার পর থেকেই। বিশ্বাস কর, যা হচ্ছিল আর যা করছিলাম কোনটাইও আমার নিজের ইচ্ছায় নয়। তুমি কষ্ট পাচ্ছিলে আমার এরকম আচরণে– বুঝতে পারছিলাম কিন্তু আমার কিছুই করার ছিল না। ওই চুড়িটা আমাকে বদলে দিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারিনি চুড়িটা।'

ওর কথা শুনে আমি হেসে বললাম, 'থাক হয়েছে। সারাজীবন আর তোমাকে কোনো চুড়ি পড়তে দেব না আমি। এসব ঢঙ্গের ডিজাইনের কিন্নরী-অপ্সরা চুড়ি পরা তোমার জন্য নিষিদ্ধ।'

আমার কথা শুনে চোখ মেলে তাকাল অতসী। ওর চোখের মাঝে আমি আবার ফিরে পেলাম নিজেকে। এই তো আমার সেই ভালোবাসার মেয়েটি।

এ সময় ডিউটিতে থাকা নার্স চলে এল ভেতরে। এসে দেখল, আমরা দু'জন হাত ধরে একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। অতসীর রিপোর্ট ফাইলটা হাতে নিয়ে কিড়মিড় করে উঠল সে, 'আজকাল ছেলেমেয়েদের রাখঢাক বলে কিছু নেই। কী যে হয়েছে এদের? অসভ্য মানসিকতা! হাসপাতালে এসেও এরা প্রেম করতে ছাড়ে না।'

নার্সের এসব কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমার। আমরা এমন কিছুই করিনি যে, নার্স এরকম অভিযোগ তুলতে পারে। কড়া কিছু কথা বলতে যাচ্ছিলাম আমি। কিন্তু অতসী আড়চোখে না করল আমাকে। ইশারায় নার্সের হাতের দিকে তাকতে বলল আমাকে। এবার সত্যিই খানিকটা চমকে গেলাম আমি। অতসীর হাতের সেই চুড়ির মতই হুবহু আরেকটি কিন্নরী চুড়ি এখন নার্সের বাম হাতের শোভা বাড়াচ্ছে।

ঝাড়ন

এক

রুমা আজ খুব সুন্দর করে সেজেছে। আজ আনিস দেশে ফিরবে। বেচারা জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়ায়। খাওয়া দাওয়ার ঠিক নেই। তাই রুমা আজ যত্ন করে আনিসের পছন্দের সব খাবার রান্না করেছে। আনিস চিটাগাং থেকে প্লেনে করে ঢাকায় আসবে। রুমার খুব ইচ্ছে ছিল আনিসকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে যাওয়ার। কিন্তু আনিস ওর ফ্লাইট টাইম কনফার্ম করতে পারেনি রুমাকে। আনিসের আসতে আসতে দুই তিন ঘন্টা এদিক ওদিক হতে পারে। তাই রুমা আর যায়নি এয়ারপোর্টে। আজকে বাসায় আর কেউ নেই। রুমার ওর কাজের মেয়েটাকে বিদায় করে দিয়েছে। আজকের রাত শুধু রুমা আর আনিসের। লাইফে ওরা খুব স্ট্রাগল করেছে। রুমা অনার্সে পড়ার সময় আনিসের প্রেমে পড়ে যায়। আনিস তখন সবে মাত্র মাস্টার্স শেষ করেছে। দুজনের পরিবারের কেউই ওদের ভালোবাসার ব্যাপারটা মেনে নেয়নি। বরং ওদের আলাদা করতে আরেক জায়গায় বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিল রুমার বাবা। শেষপর্যন্ত পালিয়ে গিয়ে কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে করে ফেলে দুজনে। তারপর এদিক ওদিক করে আনিসের জাহাজে চাকরি। এখন অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছে ওরা। বাচ্চা কাচ্চা নেওয়া হয়নি আর। রুমাকে সারাদিন একা একা থাকতে হয়। রুমা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে, এ সময় বেজে উঠল কলিংবেল।

রুমা আয়নার নিজেকে শেষবারের মত দেখে নেয়। আনিসকে আজ সে মুগ্ধ করেই ছাড়বে। দরজা খুলেই রুমা ভয়াবহ আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। দরজার ওপাশে বিকটদর্শন বিভৎস চেহারা নিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

রুমার এই অবস্থা দেখে আনিস মুখোশটা একটানে খুলে ফেলল। আনিসকে দেখতে পেয়ে রুমা আনিসের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'তুমি আমাকে এভাবে ভয় দেখালে কেন?'

আনিস রুমার মাথায় হাত বুলিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'অ্যাই মেয়ে, কাঁদছো কেন? এত বোকা তুমি!'

রুমা জবাব দেয় না। চোখ মোছার চেষ্টা করছে একটু পর পর। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে রুমার দুবাহু জড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নেয় আনিস। মুখোমুখি তাকিয়ে মুগ্ধ ভঙ্গিতে বলল, 'অ্যাই, তুমি তো দেখছি আর মানুষ নেই। পরী-টরী হয়ে গিয়েছো নাকি?'

রুমা এবার চোখ মুছে আনিসের চোখের দিকে তাকিয়ে ছেলেমানুষির মত করে বলে, 'হু! আন্দাজে!'

আনিস আবারও হেসে বলল, 'উহু কোনো আন্দাজ-টান্দাজ নয়! যে রূপ দেখছি–
পার্লার থেকে সেজে না আসলে পরীরাও তোমার পাশে দাঁড়িয়ে পাত্তা পাবে না।'

আনিসের কথা শুনে এবার সত্যি সত্যিই লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে রুমার চোখে মুখে।

দুই

রাতে খাবার পর আনিস ওর ব্যাগ খুলে এটা ওটা বের করে রুমাকে দেখাচ্ছে। আনিস ফেরার সময় দেশের বাইরে থেকে অদ্ভুত আর বিচিত্র সব জিনিস সঙ্গে নিয়ে আসতে পছন্দ করে। আনিসের এসব উদ্ভট আর আজব জিনিসপত্রের বহর দেখে মাঝে মাঝে মহাবিরক্ত হয় রুমা। এই যেমন আজকে আসতে না আসতেই

ওই ভয়াবগ মুখোশটার কারণে ভয় পেতে হল রুমাকে। আনিস কি একটা ক্রিস্টালের ব্যপারে লেকচার দিচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। এ সময় ব্যাগের ভেতরে
র‍্যাপিং পেপারে মোড়ানো লম্বা কিছু একটার দিকে চোখ পড়ে যায় রুমার, 'অ্যাই, এটা কী?"

আনিস রহস্যের হাসি হেসে বলল, 'ডাস্টার, মানে ঝাড়ন।' রুমা কৃত্রিম রাগে ভঙ্গি করে বলল, 'তুমি যে কি-না। দেশের বাইরে মানুষ কত কি কেনে! আর তুমি কিনলে ঝাড়ু?'

আনিস মাথা নেড়ে বলল, 'আগে শোনই না এর কাহিনী। এবার ভেনিসে আমার সঙ্গে হঠৎ এক জিপসির দেখা। ওদের কাছে যে অদ্ভুত সব জিনিস থাকে সে কথা জানোই। এই জিপসির কাছেও আছে অনেককিছুই। কিন্তু বিক্রি করবে না। আমি নাছোড়বান্দা। বললাম, 'বেচতে হবে না। দেখতে চাই।' ব্যস জিপসিকে রাজি করিয়ে দেখলাম অনেক কিছুই। সবশেষে দেখলাম, এই ঝাড়নটা। মজার ব্যপার কি জানো? ঝাড়নটা পানি শুষে নিতে পারে। দেখেই পছন্দ হয়ে গেল জিনিসটা।
কিন্তু জিপসি ব্যাটা কিছুতেই এটা হাতছাড়া করবে না। পরে অনেক গাল-গপ্পো মেরে পটিয়ে-টটিয়ে এই ঝাড়নটা রেখে দিয়েছি।

রুমা অবাক হয়ে বলল, 'সত্যি এটা পানি শুষে নেয়?'

আনিস কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিছুটা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল, 'কী জানি? পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। তবে আমি এটা কিনেছি ডাস্টারটার অদ্ভুত কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে।'

'কী সেটা?' রুমা আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

আনিস র‍্যাপিং পেপার খুলে ডাস্টারটা বের করে রুমাকে দেখিয়ে বলে, 'লক্ষ্য কর, ডাস্টারটার মূল কাঠামো থেকে শালগুলো অসংখ্য শুঁড়ের মত বেড়িয়ে আছে– যেন একটি জীবন্ত প্রাণী। আর ঝাড়নের হাতলটা ছুঁয়ে দেখ। কেমন যেন ঈষদউষ্ণ।

আনিসের হাত থেকে ঝাড়নটা হাতে নিয়ে ভয়াবহভাবে চমকে ওঠে রুমা। আনিস সত্যিই বলেছে– ঠিক যেন কোনো প্রাণীর ত্বকের মত। কিন্তু আনিস ওর কথা শুনে হাসাহাসি করবে ভেবে কিছুই না বলে ঝাড়নটা ফিরিয়ে দিল। ঝাড়নটা আবার ব্যগের মধ্যে রেখে দিয়ে আনিস বলতে শুরু করে তার এক স্কুল ফ্রেন্ডের গল্প। এবার এক পোর্টে নেমে যার সঙ্গে হুট করে দেখা হয়ে গিয়েছিল। রুমা একটু আগের সব আতঙ্ক আর শিহরনের কথা ভুলে গিয়ে মগ্ন হয়ে আনিসের গল্প শুনতে থাকে।

তিন

দিন কয়েক পর। ড্রইংরুমে বসে একটা লাইফস্টাইল ম্যাগাজিনে চোখ বুলাচ্ছিল পড়ছিল রুমা। কাজের মেয়েটাকে কিছুক্ষণ আগে বলেছে, 'এক গ্লাস পানি দিয়ে যেতে। মেয়েটা এত দেরি করছে কেন কে জানে!'

রুমা বিরক্ত হয়ে আবার ডাকতে থাকে মেয়েটাকে, 'রুবিনা, অ্যাই রুবিনা! পানি আনতে এতক্ষণ লাগে?"

রুমার ডাক শুনে এবার ছুটে আসে রুবিনা। তাড়াহুরো করে রুমার হাতে দিতে গিয়েই পিছলে নীচে পড়ে গেল পানিভর্তি গ্লাসটা। মুহুর্তেই ভাঙা কাচের টুকরো হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল নিজেকে। রুমা কিছু বলতে গিয়েও বলল না রুবিনাকে। এমনিতেই মেয়েটা মুখ কালো করে ফেলেছে। তাছাড়া দোষ তো রুবিনার একার নয়।

ম্যাগাজিনটা টেবিলে রেখে সোফার অন্যপাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল রুমা। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে রাখা সেই ডাস্টারটাও পড়ে গেল ভাঙা কাচের টুকরোগুলোর ওপরে।

রুমা সরে দাঁড়িয়ে ভ্রু কুঁচকে বলল, 'এটা আবার এখানে কোত্থেকে এল?'

'ভাইজান সকালবেলা এইডা দিয়া বই ঝাড়ছিল।' জবাব দিল রুবিনা।

রুমা কাজের মেয়েটাকে ডাস্টারটা তুলে কাঁচের টুকরোগুলো সরিয়ে পানি মুছে ফেলতে বলে সাবধানে পা ফেলে বেডরুমে চলে গেল। একটু পরই রুবিনা ভীত সন্তস্ত্র গলায় ড্রইংরুম থেকে চিৎকার করে বলল, 'আপা-আপা জলদি আসেন।'

রুমা একছুটে বেডরুম থেকে এস জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে কী হয়েছে?'

কাজের মেয়েটা চোখ বড় বড় করে বলল, 'আপা, দ্যাখেন– এক্কেরে পানি নাই। সব শুকায় গেছে।'

রুমা দেখল, 'যেখানে ডাস্টারটা পড়েছিল তার চারপাশের সমস্ত পানি যেন বাতাসে উবে গেছে। শুধু ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো পড়ে আছে। ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারে না রুমা। তাহলে কী ডাস্টারটা আসলেই পানি শুষে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে? কিন্তু তা কী করে হয়! নিশ্চয়ই ব্যাপারটার অন্য কোনো ব্যাখা আছে। রুমা অবশ্য রুবিনার সামনে বিষয়টিকে একবারেই পাত্তা না দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'না, এটা এরকমই। পানি পরিষ্কার করে। তোর ভাই বিদেশ থেকে এনেছে।'

রুবিনা অবাক হয়ে বলল, 'আপাগো, এমন আজব ঝাড়ু আমি জীবনেও দেখি নাই। আমার কেমন জানি ডর করতাছে।'

রুবিনার কথার ধরণ শুনে না হেসে ফেলল রুমা, 'থাক, আর কথা বাড়াতে হবে না। তুই ঝটপট কাঁচের টুকরোগুলো তুলে ফেল্। দেখিস, যাতে কোনো টুকরো যেন থেকে না যায়। তাহলে কিন্তু যখন তখন পা কেটে যেতে পারে।'

রুবিনা একটা প্লাস্টিকের ট্রেতে সাবধানে কাচের টুকরোগুলো তুলতে শুরু করে। সবকিছু ঠিকঠাক আছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেডরুমের দিকে পা বাড়ায় রুমা। কিন্তু টেবিলে পড়ে থাকা ঝাড়নটার দিকে চোখ পড়তেই আবার কেন যেন এক অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল রুমার।

চার

আরও কিছুদিন পরে।
রাতে গল্প করছে আনিস আর রুমা।
'আনিস, তুমি কী একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ?' চিন্তিত কণ্ঠে বলল রুমা।
আনিস জবাব দিল, 'কী বলতো? সিরিয়াস কিছু?'
'আসলে তোমার সেই ডাস্টার মানে জিপসির ঝাড়নটাকে আমার ভয় লাগছে।'
'কী– সব বলছ?'
'একটা ডাস্টারকে তুমি ভয় পেতে যাবে কেন?'
'না– মানে ওটাকে দেখলে কেমন কেমন যেন লাগে!'
'কেমন লাগে– ?'

তুমি খেয়াল করনি– ডাস্টারটা নিয়ে আসার পর থেকে আমি কোনো পোকামাকড়, তেলাপোকা, টিকটিকি পর্যন্ত আমাদের বাসায় দেখছি না।'

আনিস সহজ গলায় বলল, 'তাহলে তো ভালই হয়েছে। ঘর থেকে সব থার্ডপার্সন দূর হয়ে যাচ্ছে। তুমি আমার সঙ্গে কী করছ তা দেখার জন্য কেউ থাকছে না।'

রুমা আনিসের রসিকতায় সাড়া দিতে পারল না। সবসময়ই কেন যেন এক অজানা আশঙ্কায় ধুক ধুক করছে চারপাশ। 'আচ্ছা, তোমার ওই ডাস্টারটায় কোনো জাদু-টাদুর ব্যাপার নেই তো আবার? জিপসিরা তো জাদু জানে শুনেছি'

আনিস একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আরে নাহ! জিপসিদের যত বুজরুকি!'

রুমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'না শোনো তোমাকে একটা কথা বলাই হয়নি। সেদিন না সত্যি সত্যিই তোমার ডাস্টারটা পানি শুষে নিয়েছিল।' রুমা আনিসকে ঘটনাটা খুলে বলল।

সব শুনে আনিস বলল, 'দূর! আমি তো সেদিন ঝাড়নটা পানি শুষে নেওয়ার ক্ষমতার কথা ঠাট্টা করে বলেছিলাম। জিপসি বুড়ো আমাকে ওরকম কিছুই বলেনি। আর তুমি সে কথা সত্যি ভেবে বসে আছো? হয়তো অন্য কোনো কারণে পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। তুমি অযথা দুশ্চিন্তা করো না।'

রুমার সংশয় তবু কাটে না!

পাঁচ

আজ রুমা আর আনিসের ম্যারেজ ডে। এই দিনেই আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল রুমা। ভাবতেই অনেক পুরানো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল রুমার। বাবা এখনও রাগ করে আছে। মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে ফোনে কথা হলেও দেখা হয়নি। আনিসের অবস্থাও তাই। পরিবারে কারও সঙ্গেই যোগাযোগ নেই। তাই ঘটা করে কোনো আয়োজনে যায় না ওরা। দুজনে নিজেদের মত করেই দিনটা পার করে ওরা। এবারের প্ল্যানও গুছিয়ে রেখেছে রুমা। রুবিনার আজ ছুটি। ছুটি পেয়েই মেয়েটা তার কোন আত্মীয়র বাসায় যেন গিয়েছে। অনেকদিন থেকেই যেতে চাইছিল। কিন্তু বাসায় একদম একা থাকতে পারে না রুমা। তাই রুবিনারও যাওয়া হচ্ছিল না।

আজকে সারাদিন আনিস আর রুমা বাইরে ঘুরবে। কিছু টুকটাক শপিং সারবে। তারপর রাতে কোনো রেস্টুরেন্টে খেয়ে তারপর বাসায় ফিরবে। রুমা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চোখে আই লাইনার দিচ্ছিল– এমন সময় ড্রইংরুম থেকে আনিসের গলা শুনতে পায়। 'রুমা, ডাস্টারটা কোথায় বল তো?'

'কেন ডাস্টার দিয়ে কী করবে?' আয়নার সামনে বসেই জানতে চাইল রুমা।

'এই দেখ না– আমার এই শার্টের বক্সটার ওপর কেমন ধুলো জমে আছে। পরিষ্কার করতে হবে।'

'ওই তো– শোকেসের ওপরেই তো রাখা আছে।'

'কোথায়– খুঁজে পাচ্ছি না তো', ড্রইংরুম থেকে বলল আনিস।

'দাঁড়াও আমি আসছি।' বলে রুমা আই লাইনার নামিয়ে রেখে ড্রইংরুমে চলে এল। এসে দেখে বেচারা আনিস ধুলোপড়া শার্টের বক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শো-কেসের ওপর তাকাতেই বুকটা ধ্বক করে ওঠে রুমার। ডাস্টারটা শো-কেসের ওপর নেই। অথচ খানিক্ষণ আগেই রুমা নিজের হাতে শো-কেসের ওপর রেখে গিয়েছে। কিন্তু মুহূর্তেই উধাও। যেন ওটার হাত-পা গজিয়েছে। হঠাৎ করেই একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে যায় রুমার মাথায়। ঝাড়নটা কোনো জীবন্ত প্রাণী নয়তো। যা হয়তো মানুষের অজানা বিলুপ্ত প্রায় কোনো প্রাণী। এক অজানা আতঙ্ক এসে ভর করে রুমার ওপর! 'আনিস, ওটা কোনো জীবন্ত প্রাণী নয় তো? এখান থেকে না হলে সরে গেল কিভাবে?'

আনিস ভ্রু কুঁচকে বলে, 'কি যা–তা বলছ, ওটা স্রেফ একটা ডাস্টার! রেখেছে হয়তো অন্যকোথাও!'

আনিসের এই উড়িয়ে দেওয়াকে একেবারেই মেনে নিতে পারে না রুমা, 'আমার স্পষ্ট মনে আছে– আমি কয়েক মিনিট আগেই ওটাকে এখানে রেখেছিলাম।'

'থাক, বাদ দাও তো', এগিয়ে এসে রুমার হাত শক্ত করে ধরে আনিস। 'রুমা, বি ইজি ডিয়ার। যাও, তাড়াতাড়ি তোমার সজ্জাপর্ব শেষ কর। আমরা এক্ষুণি বেরুব।' তাগাদা দেয় আনিস।

রুমা অন্যমনষ্ক হয়ে বেডরুমে পা বাড়ায়। হঠাৎ পায়ে কী যেন জড়িয়ে আছে বলে মনে হয় রুমার। শাড়িটা একটু উঁচু করে তুলতেই দেখে, গোড়ালি থেকে হাটু পর্যন্ত ঝাড়নটা লম্বা শালগুলো দিয়ে পা জড়িয়ে ধরেছে। রুমা আতঙ্কে পা ঝাড়া দিয়ে চিৎকার করে ওঠে। আনিস ড্রইংরুম থেকে ছুটে এসে দেখতে পায়, রুমার পা জড়িয়ে ধরেছে ঝাড়নটা। ঠিক যেন একটা জীবন্ত প্রাণীর মত করে। রুমা চিৎকার করতে করতে আতঙ্কে জ্ঞান হারিয়ে পরে যায় মেঝেতে। আনিস ছুটে গিয়ে ওটাকে রুমার পা থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে। রুমার পা ছেড়ে দিয়ে প্রাণীটা চট করে আনিসের ডানহাতে চেপে বসে। একসঙ্গে যেন লক্ষ সূঁচ ফোটাবার যন্ত্রণা অনুভব করে আনিস। আতঙ্কিত চোখে আনিস দেখতে পায়, অজ্ঞান রুমার বাম পায়ের গোড়ালি থেকে হাটু পর্যন্ত অসংখ্য সূঁচের সুক্ষ্ম ফুটো। ফুটোগুলো দিয়ে বেড়িয়ে আসছে বিন্দু বিন্দু রক্ত। আনিস জীবনে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু এরকম ভয়াল কোনো প্রাণীর সামনে পড়তে হয়নি কখনও।

আনিস উপলব্ধি করতে পারছে, এই জিনিসটাকে ঠেকাতে না পারলে দুজনেই মৃত্যুই অবধারিত। আনিস চিৎকার করতে করতে ড্রইংরুমে ছুটে যায়। একটা অ্যান্টিক মোমদানীকে হাতের কাছে পেয়ে ওটাকে দিয়েই আঘাত করতে শুরু করে ঝাড়নটাকে। কিন্তু তাতে করে ওটার তো কিছু হচ্ছেই না। উল্টো হাতে ব্যাথা লাগছে আনিসের। কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। আশপাশে তাকাতেই চোখে পড়ল শো-কেসের ভেতরে রাখা ওর শখের লম্বা ধারলো ছুড়িটা। গ্লাস খোলার সময় নেই। বাহাতে ধরে রাখা মোমদানীটা দিয়েই শো-কেসের গ্লাস ভেঙ্গে ফেলল আনিস।

তারপর একটানে ওটা বের করে এনে ঝাড়নটার মাঝ বরাবর ছুঁড়ি চালাতে
শুরু করে আনিস। মুহূর্তেই ওটা দিখণ্ডিত হয়ে আনিসের হাত থেকে ছিটকে পড়ে মেঝেতে। ভেতর থেকে গলগল করে বেড়িয়ে আসছে রক্ত। আনিসের হাতেও রুমার পায়ের মতই অসংখ্য সূঁচের ফুটো দেখা যাচ্ছে। ঝাড়নটা দু'টুকরো হলেও এখনও নড়াচড়া বন্ধ করেনি। টুকরো দুটোর ভেতর থেকে গলগল করে বেড়িয়ে আসছে রক্ত। রক্তাক্ত ডানহাত আর বামহাতে রক্তমাখা ছুড়ি নিয়ে ভীষণ ঘৃণায় আতঙ্কিত চোখে আনিস তাকিয়ে থাকে ও দুটোর দিকে। পরক্ষণে আনিস কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝাড়নের এক টুকরো ছিটকে ওর ছুড়ি ধরে থাকা হাতে চেপে বসে। আর অন্যটা ছুটে এসে ঠিক গলায় পড়ে থাকা বেল্টের মত করে পেঁচিয়ে ধরে আনিসকে। গলায় লক্ষ সূঁচ ফোটার তীব্র যন্ত্রণায় সহ্য করতে না পেরে ভয়ানক স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে

চেয়েছিল আনিস। কিন্তু কোনো শব্দই বের হল না গলা থেকে। হাত থেকে ছুড়িটা মেঝেতে পড়ে 'ঠন্' করে একটা ধাতব শব্দ হলো কেবল!

পরিশিষ্ট

কাজ শেষ করে এবার ড্রইংরুম থেকে বেডরুমের দিকে যেতে থাকে ঝাড়নের টুকরো দুটো। জানে– ওখানে আরও খাবার আছে। কিন্তু চাইলেও আগের মত দ্রুত ছিটকে যেতে পারছে না। কারণ ওদের পেট ভর্তি হয়ে আছে ড্রইংরুমে পড়ে থাকা খাবারটার সুস্বাদু তাজা রক্তে!

মায়াপুরী

এক

আমি পুকুরে ছিপ ফেললে কখনোই মাছ ধরা পরে না। ধরা পরে কখনো সাপ কখনো ব্যাঙ আবার কখনোবা ফিতা ছেঁড়া স্যান্ডেল। তারপরেও আজকে দুপুরে কি মনে করে যেন সময় কাটানোর জন্য পুকুরে ছিপ ফেলে বসে ছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি। দু'একবার যে ছিপে টান লাগেনি তা নয়। কিন্তু আমি অবশ্য এখন পর্যন্ত কিছুই জল থেকে টেনে ডাঙ্গায় তুলতে পরিনি। মনটা বেশ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আবার ছিপে টান পরতেই মনটা ভালো হয়ে গেল। বেশ জোরালো টান। আমিও বেশ টানাটনি শুরু করে দিলাম। কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল পুকুরের পানিতে যেন একটা সাইক্লোন ঢুকে পড়েছে। হাত থেকে ছুটে যায় যায় অবস্থা। তাই বুদ্ধি করে পুকুর পাড়ের তাল গাছের সাথে ছিপের দড়িটা কয়েকবার পেঁচিয়ে দড়ি ধরে দিলাম এক হেঁচকা টান। মূহুর্তেই কি হল- জানি না। দেখি– এক থুড়থুড়ে বুড়ো মতন এক লোক পানি থেকে উঠে এসেছে। তার বিশাল সাদা দাড়িতে আমার ছিপের হুক আর দড়ি জটিলভাবে পেঁচিয়ে গেছে। বুড়োটা আমাকে দেখতে পেয়ে সোজা আমার দিকে হেটে চলে এল। এরপর আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই বুড়ো আমার গালে কষে এক চড় মেরে আমাকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দিল।

পানিতে পড়ার পর মনে হল পুকুরে নয়, উত্তাল এক মহাসাগরে পরে গেছি। বিশাল বিশাল ঢেউয়ের মাঝে ক্রমাগত খাবি খেলাম বেশ কিছুক্ষণ। প্রায় ডুবেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু শেষ মূহুর্তে নিজেকে খানিকটা সামাল দিয়ে পনির উপর ভেসে উঠে পুকুরের পরের দিকে সাঁতরাতে শুরু করলাম। সাঁতার কাটতে কাটতে আমার মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল– এতবড় পুকুর কাটার কি দরকার ছিল। সাঁতার কাটছি তো কাটছিই কিন্তু কিছুতেই আর পুকুরের পাড়ে যেতে পারছিলাম না। এভাবে কতক্ষণ পর যে পাড়ে পৌঁছেছি মনে নেই। পায়ে মাটির নাগাল পেয়ে খানিকটা হেটে এসে পুকুরের পাড়েই শুয়ে হাঁসফাঁস করে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম।

আর মনে মনে ভাবছিলাম, বুড়ো শালাকে একবার পেয়ে নেই। ওকে ধরে একটা অ্যাকুরিয়ামে রেখে দিব। তারপর টিকেট করে মানুষজনকে দেখিয়ে টাকা কামাব।

একটু ধাতস্ত হয়ে উঠে দাড়ালাম। কিন্তু আশেপাশে বুড়োকে কোথাও দেখা গেল না। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু ব্যবসার প্ল্যানটা একেবারে মন্দ ছিল না।

হেটে হেটে খানিকটা এগুতেই বুঝতে পরলাম, কোথাও একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। কিন্তু কী সেটা ধরতে পারছিলাম না। আরো একটু হাটতেই খেয়াল করলাম, আমি যেখানে পা ফেলেছি সেখানে আগে কখনোই এর আগে আমি আসিনি। এটা অন্য কোথাও; অন্য কোনো জায়গা।

পানির নিচে পাতালপুরী আছে শুনেছি। সেটা হলে তো এখানে পানি থাকার কথা। কিন্তু মাটি তো দেখা যাচ্ছে খটখটে শুকনো। তাহলে কি আমি মারা গেছি। আচ্ছা এটা স্বর্গ না নরক? সেটা জানতে হলে তো এখানকার কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি একটা মাঠের ভেতর দিয়ে হাটতে শুরু করলাম।

হাটছি– হাটছি। হঠাৎ করে দেখি, মাঠের একপ্রান্তে একটা ঘোড়া নিশ্চিন্ত মনে ঘাস চিবুচ্ছে। তবে ঘোড়াটা বেশ স্বাস্থ্যবান। আজকাল এমন ঘোড়ার দেখা পাওয়াই যায় না। ঘোড়াটার কাছাকাছি যেতেই ঘোড়াটা মুখ তুলে আমাকে দেখে বললো, 'কী জনাব, ঘাস খাবেন? আপনাকে খুবই বিষণ্ন লাগছে। ঘাস খেলে মন থেকে বিষণ্নতা দূর হয়ে যেতে পারে।'

আমি ঘোড়াটার কথা শুনে খানিকটা বিরক্ত হলাম, 'না ধন্যবাদ। আমি দুপুরে খেয়ে বের হয়েছি। আপনি কি আমাকে একটা ইনফরমেশন দিতে পারেন?'

ঘোড়াটা খুবই আগ্রহের সাথে বললো, 'কী জানতে চান বলুন?'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা এটা কি স্বর্গ না নরক?'

ঘোড়াটা আমার কথা শুনে খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'স্বর্গ কী আর নরক কী?'

আমি মনে মনে ভাবলাম, সর্বনাশ হয়েছে– একে এখন স্বর্গ-নরক বোঝানোর ঝামেলায় যাওয়া যাবে না।

আমি এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'ও কিছু না। এ জায়গাটার নাম কী?'

ঘোড়া তার লেজ নেড়ে বলল, 'এটা মায়াপুরী।'

'কী?'

'মায়াপুরী!?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এটা পৃথিবীর কোন জায়গায়?'

ঘোড়াটা ঘাস চিবুতে চিবুতে বললো, 'ও আপনি পৃথিবী থেকে এসেছেন? সেখানে তো অনেক উন্নতমানের ঘাস পাওয়া যায়।'

আমি বললাম, 'এটা কি পৃথিবীর বাইরে কোথাও নাকি?'

ঘোড়াটা মাথা নেড়ে বলল, 'কেন আপনি জানেন না বুঝি?'

আমি কী বলব বুঝে উঠতে পরছিলাম না।
ঘোড়াটা বোধহয় আমার অবস্থা খানিকটা অনুমান করতে পেরে বললো, 'আপনি কী পৃথিবীতে যেতে চান?'

আমি ভাবনার জগত থেকে বেড়িয়ে এসে বললাম, 'আপনি পারবেন আমাকে পৃথিবীতে নিয়ে যেতে?'

ঘোড়াটা মাথা নেড়ে বললো, 'অবশ্যই পারবো। কিন্তু মিটারে যা আসে তার চেয়ে বিশ টাকা বাড়িয়ে দিতে হবে।'

আমি ভ্রু কুঁচকে বললাম, 'আপনার আবার মিটার আছে নাকি?'

ঘোড়াটা তার পিঠের দুপাশ থেকে দুটো বিশাল আকৃতির ডানা বের করতে করতে বলল, 'আগে ছিল না। কিন্তু মিটার না থাকলে মায়াপুরীর বাইরের প্যাসেঞ্জাররা ভাড়া নিয়ে নানান ঝামেলা করে। তাই মিটার ইউজ করছি।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে উড়ুক্কু ঘোড়ার ওপর চড়ে বসলাম। এখানকার ঘোড়ার যা অবস্থা দেখছি– যখন তখন ডানা গজিয়ে যায়। মানুষজনের অবস্থা যে কী– কে জানে? বেশিক্ষণ না থাকাই ভাল।

ঠিক এ সময় বাতাস থেকে যেন পাঁচজন মানুষ বেড়িয়ে এসে আমার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। মানুষগুলোর পরনে অদ্ভুত সব পোশাক। এদের মাঝে আবার একটা মানুষের মাথায় একটা গ্রীক ধাঁচের লাল শিরণাস্ত্রও আছে। তাকেই দলটার নেতা বলে মনে হল। নেতা টাইপের লোকটা আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার পরিচয় কী? পরিচয়পত্র দেখান।'

আমি নিরীহ গলায় বললাম, 'আমি এখানে অপরিচিত। তাই আমার কোনো পরিচয়পত্র নেই।'

পাশ থেকে আরেকটা লোক বলল, 'ওস্তাদ, ব্যাটা দুই নম্বর মাল মনে হয়।'

ওস্তাদ তার সাগরেদকে হালকা একটা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোথেকে এসেছেন? আপনার কোনো পাসপোর্ট আছে?'

আমি আরও নিরীহ গলায় বললাম, 'জ্বী, পৃথিবী থেকে এসেছি। আসার সময় পাসপোর্ট অফিসার টাকা চেয়েছিল। টাকা দেই নাই বলে পাসপোর্ট রেখে দিয়েছে।'

লাল টুপি পরা ওস্তাদ আর দেরি করলেন না। তার সাগরেদদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অ্যারেস্ট দেম।' মুহূর্তেই তার চার সাগরেদ, আমার আর উড়ুক্কু ঘোড়ার দিকে ছুটে এল।

দুই

মহাবিচিত্র পোশাক পরিহিত সেই চৌকস দলটির সাথে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি বিশাল এক হলরুমে। রুমের একপ্রান্তে একটা বেতের চেয়ারে এক ব্যক্তি লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বসে আছে। আমাদেরকে সম্ভবত তার কাছেই নিয়ে আসা হয়েছে। সম্ভবত বলছি কারণ এখন পর্যন্ত উনি কোনোরকম কথাবার্তা বলেননি। আর বলার ইচ্ছা আছে বলেও মনে হচ্ছে না। যদিও মনে হচ্ছে, তিনি এই জগতের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। উনি অবশ্য আপাতত ভিডিও গেমসের মতো কি একটা হাতে নিয়ে বসে আছেন এবং গভীর মনোযোগের সাথে একটু পর পর সেটার বাটনগুলোতে হাত বুলাচ্ছেন।

লাল টুপি পরা ওস্তাদ একটু পর পর গলা খাঁকাড়ি দিচ্ছে। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হচ্ছে না। বত্রিশতম খাঁকাড়ি দেওয়ার পর উনি মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু বলতে চাও?'

লাল টুপি কথা বলার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাই শুরুতেই খেই হারিয়ে ভয়ংকর রকমের শুকনো কাশি শুরু হয়ে গেল তার।

বেশ খানিক্ষণ পর কাশি থামিয়ে লাল টুপি পরা ওস্তাদ বললেন, 'মহামান্য, একজন পৃথিবীবাসী ও একটি উড়ুক্কু ঘোড়াকে আটক করা হয়েছে।'

'এদের অপরাধ?'

'পৃথিবীবাসীর গতিবিধি সন্দেহজনক। সে পাসপোর্ট ছাড়াই মায়াপুরীতে ঘোরাঘুরি করছিল।'

‘আর উড়ুক্কু ঘোড়া কী করছে?’

‘সে পৃথিবীবাসীর কাছে মিটারের নির্দিষ্ট ভাড়ার চাইতে বিশ টাকা অতিরিক্ত দাবি করেছে।’

মহামান্য এবার বেতের চেয়ারে পায়ের উপর পা তুলে বললেন, ‘হু দুজনের অপরাধই দেখছি গুরুতর! এ জন্য দুজনকেই...’

মহামান্যের কথা মাঝখানে কথা থেমে গেল। মহামান্যের হাতের ভিডিও গেমসটি হঠাৎ করেই ‘ট্যাট ট্যাট ট্যাট’ মার্কা আওয়াজ করতে শুরু করেছে।

মহামান্য যন্ত্রটির একটা বাটন চেপে চুপচাপ সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মিনিট দুয়েক পর মহামান্য সেটা থেকে মুখ তুলে লাল টুপির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘এই মাত্র খবর এসেছে, মায়াপুরীর উত্তরের অংশে এক ভয়ংকর খোক্ষস ঢুকে পরেছে। সে হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে। কী করা যায়, বল তো?’

লাল টুপি সাথে সাথে বলে বসলো, ‘খোক্ষস নিধনে এই দুই অপরাধীকে পাঠালে কেমন হয়, মহামান্য?’

কথা শুনে মহামান্যের মুখে হালকা আনন্দের ছাপ লক্ষ্য করা গেল, ‘হুম, বুদ্ধিটা আমারও বেশ পছন্দ হয়েছে। তবে তাই হোক।’

আমি মহাতঙ্কে আঁতকে উঠলাম– এরা এসব কি বলছে! শেষপর্যন্ত রাক্ষস-খোক্ষসের মুখোমুখি! গ্লাডিয়েটর না বানিয়ে ছাড়বে না দেখা যাচ্ছে!

আমি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা উড়ুক্কুর দিকে তাকালাম। কিন্তু তার চেহারায় কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। অবশ্য ঘোড়াদের চেহারায় ভাবান্তর হলেও ধরা পরার কোনো উপায় নেই।

আমি দুর্বলভবে হলেও প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করলাম, ‘আমি কেন আপনার রাজ্যের খোক্ষস মারতে যাব?’

মহামান্য হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘এটা তোমার অপরাধের মাসুল। অবশ্য খোক্ষস মেরে দিতে পারলে আমার মেয়ের সাথে তোমার বিবাহ দেব।’

খোক্ষসের মৃত্যুর সঙ্গে বিবাহের কী সম্পর্ক আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু নতুন কোনো ঝামেলার ভয়ে কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ মাথা নাড়লাম।

তিন

উড়ুক্কু আর আমি উড়ে চলছি আকাশ পথে। শূণ্যে উঠেই আমি উড়ুক্কুকে নানাভাবে হাত করার চেষ্টা করেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, উড়ুক্কুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পৃথিবীর দিকে নিয়ে যাওয়া। বলেছিলাম, মিটারের চেয়ে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিব। কিন্তু উড়ুক্কুর লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে বলে উড়ুক্কু রাজিই হলো না।

আমাকে একটা খোক্ষস ইন্ডিকেটর দেওয়া হয়েছে। এখন খোক্ষসটার অবস্থান কোথায় সেটা আমাকে এই ইন্ডিকেটর জানিয়ে দেবে। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে ইন্ডিকেটরটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

হঠাৎ একটা পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে যেতেই ইন্ডিকেটরের লালবাতি জ্বলে উঠে 'ট্যাট ট্যাট' শব্দ করতে লাগলো। আমি উড়ুক্কুকে এ কথা বলতেই সে আকাশে দুইবার গোত্তা খেয়ে নিচে নেমে এল।

খোক্ষস নিধনের জন্য আমাকে অতি বিচিত্র একটি অস্ত্র দেয়া হয়েছে। এই অস্ত্র ছাড়া নাকি খোক্ষস হত্যা করা যায় না। অস্ত্রটা দেখতে অনেকটা তীর-ধনুকের মতোই। ট্রিগারসহ একটা ধনুক আছে। ধনুকে তীরটা সেট করে একটা ট্রিগার চাপলেই তীরটা একটা সাপ হয়ে ছুটে গিয়ে খোক্ষসটাকে কামড় বসিয়ে দেবে। খোক্ষসটাকে মারার জন্য ওটার পেট বরাবর যে কোনো একটা সর্পতীর ঠিকমতো ছুঁড়তে পারলেই হবে। খোক্ষসটা সিটিং গেটলক সার্ভিসে সোজা নরকে পৌছে যাবে।

আমাকে সর্পতীর দেয়া হয়েছে আটটা। এরমধ্যে তিনটা অজগরীয়, দুটো ভাইপারীয় আর তিনটা অ্যানাকোন্ডীয়। আমি ঠিক করে রেখেছি, অ্যানাকোন্ডীয় ছুঁড়বো। ওটাকেই বেশ কাজের মনে হয়েছে আমার। এখানে আসার আগে এই অস্ত্রটা বেশ কয়েকবার চালিয়ে দেখেছিলাম। অ্যানাকোন্ডীয় তীর ছুঁড়লে কপ কপ করে সাপটা সবকিছু গিলে খায়।

অস্ত্রটা হাতে নিয়ে উড়ুক্কুর পিঠ থেকে মাটিতে নামলাম। খোক্ষস ইন্ডিকেটরের কাঁটা এখান থেকে ডান দিকের অরণ্যের দিকে ঘুরে আছে। আমি ধনুকে একটা অ্যানাকোন্ডীয় তীর বসিয়ে উড়ুক্কুকে এখানেই অপেক্ষা করতে বলে ইন্ডিকেটর হাতে অরণ্যে ঢুকে পড়লাম।

বনের ভেতরে অত ঘন গাছপালা নেই। ঝোপঝাড় কম। বেশ চমৎকার বন। একটা বাগান বাগান ভাব আছে। আমি ইন্ডিকেটরের সাউন্ডটা অফ করে দিলাম। না হলে বিপবিপ শব্দ শুনে খোক্ষসটা সতর্ক হয়ে যেতে পারে। ইন্ডিকেটরের কাঁটা যে দিকে ঘুরছে বনের মধ্যে আমিও সেদিকেই ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম এক দীঘির পারে। টলটলে সেই দীঘির জল। খানিকটা সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখি ছোটখাট মতো এক লোক দীঘির পাড়ে বসে আছে। এ এলাকায় একটা ভয়ংকর দানব ঘোরাঘুরি করছে– এই খবর কী সে জানে না। আমি কথা বলার জন্য লোকটার কাছে যেতেই মুখ তুলে তাকাল। লোকটা মহানন্দে কী যেন চিবুচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি চিবুচ্ছেন, চুইংগাম নাকি?'

লোকটা কথা না বলে মাথা নাড়ল।

আমি একটা ধমক দিয়ে বললাম, 'আরে বুদ্ধু কোথাকার! তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। না হলে খোক্ষস এসে তোমাকেই চুইংগাম বানিয়ে খেয়ে নেবে। এই এলাকায় যে একটা ভয়ংকর খোক্ষস ঘোরাঘুরি করছে– সে কথা জানো?'

লোকটা আবারও নিরবে মাথা নাড়ল।

খোক্ষসের মতো একটা সিরিয়াস বিষয়কে লোকটা মোটেও পাত্তা দিচ্ছে না দেখে বেশ অবাক হলাম। তাই আবারও জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাছাধন তুমি কী খোক্ষসটাকে দেখেছ?'

কোনো কথা না বলে সে সে এবারও মাথা নাড়ালো।

তাকে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে দেখে আমার মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'ওহে বুদ্ধু কাহিকা, তুমি কি কথা বলতে পার, নাকি পার না?'

লোকটা এবার আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে গমগমে গলায় বলে উঠলো, 'কী বলবে বল।'

আমি বললাম, 'চুইংগাম খাব। তোমার কাছে কী এক্সট্রা চুইংগাম হবে?'

লোকটা আমাকে একটা চুইংগাম দিল। আমি চুইংগামটা মুখে দিয়ে বললাম, 'আমি খোক্ষসটাকে খুঁজছি, বুঝেছ?'

লোকটা চুইংগাম চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞাসা করলো, 'কেন, খুঁজছো কেন?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'দেখা হলে তার সাথে পোজ দিয়ে ফটো তুলব। এই জন্য খুঁজছি। তোমার ইচ্ছে হলে তুমিও ফটো তুলতে পার। আমার সঙ্গে ক্যামেরা আছে।'

লোকটা আমার কথায় খুব একটা পাত্তা দিল না। সে আবার মুখ ঘুরিয়ে দীঘির দিকে তাকিয়ে রইলো।

আমি বললাম, 'এই বুদ্ধু, তুমি খোক্ষসটাকে কোথায় দেখেছ? ওটা কোনদিকে গেছে?'

বুদ্ধু আর কোন কথা বলবে বলে মনে হচ্ছে না। সে একমনে দীঘির পানির দিকে তাকিয়ে আছে। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম– একে দিয়ে কোনো কাজ হবে না আমার। শুধু আমার কেন এই মহাজগতে আর কারও হবে কি না সন্দেহ!

দীঘির পাড় থেকে সরে আসব কিনা ভাবছি; এ সময় দেখি লোকটার মুখ থেকে জিভ ইয়া লম্বা হয়ে বের হয়ে দীঘির মাঝ বরাবর ডুব মারলো। তার দুই সেকেন্ড পর আবার জিভটা পেঁচিয়ে ভেতরের দিকে ফিরতে শুরু করল। তবে যখন সেটা মুখের কাছকাছি চলে এল তখন দেখতে পেলাম, জিভটা খালি নয়। জিভের আগায় অক্টোপাসের মতো কি এক থলেথলে একটা প্রাণী ঝুলে আছে।

লোকটা নিমিষে সেই থলথলে প্রাণীটাকে মুখের মধ্যে নিয়ে নিল। এরপর মুখ থেকে শব্দ ভেসে আসতে লাগলো– 'কচ্! কচ্! কচ্!'

লোকটা ওই অবস্থাতেই চট করে আমার দিকে ঘুরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো– আত্মাটা আমার দেহ ছেড়ে দূরে কোথাও পালিয়ে গেছে। তখনই আমার হাত পড়ে গেল খোক্ষস ইন্ডিকেটরের সাউন্ড অন-অফ স্যুইচের ওপর।

ইন্ডিকেটর যেন এতক্ষণ এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। 'ট্যাট ট্যাট' করে গলা ফটিয়ে এলাকা গরম করে দিল মুহূর্তেই। তবে এ শব্দই যেন খানিকটা ধাতস্ত করলো আমাকে। আর তখুনি খোক্ষসটার দাঁতসহ মুখটা পাইপের মতো লম্বা হয়ে মাথা থেকে বের হয়ে ছুটে এল আমার দিকে। মূহুর্তেই আমি একপাশে লাফ দিয়ে গড়িয়ে সরে গেলাম।

আমাকে নাগালে না পেয়ে খোক্ষসের মুখটা অনেকটা ইয়ো ইয়োর মতো সামনে এসেই আবার পেছনে ফিরে গেল। তবে পিছিয়ে যাবার আগে আমি যেখানে ছিলাম ঠিক সেখানে দু'সারি ধারালো দাঁত একত্রিত হয়ে 'কিরিচ' করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দের সৃষ্টি করলো। মাথা না তুলেই বুঝতে পারলাম, ওখানে আমি দুটুকরো হতে যাচ্ছিলাম।

দেরি না করে হাতে রেডি করা অব্যার্থাস্ত্র তাক করে ট্রিগার চেপে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে খোক্ষসটার মুখ বরাবর ছুটে গেল আমার অ্যানাকোন্ডীয় তীর। কিন্তু আঘাত ব্যর্থ। কিছুই হয়নি খোক্ষসটার। অ্যানাকোন্ডার জায়গায় একটা টিকটিকি লাফাতে দেখা গেল।

সর্বনাশ! সাপের জায়গায় টিকিটিকি আসলো কেমন করে! মাথায় কিছুই ঢুকছে না তখন। কিন্তু আরো-তো দু'রকমের অস্ত্র থাকার কথা। সবই কি টিকটিকি দিয়ে দিয়েছে নাকি?

আমি আরেকটা তীর সেট করে ট্রিগার চেপে দিলাম। এবার একটা ব্যাঙ ছুটে গেল দানবের মুখ বরাবর। ব্যাঙটা খোক্ষসটার মুখ পর্যন্ত যাওয়ার মত সময়ও পেল না। তার আগে খোক্ষস নিজেই জিভ বের করে কপাৎ করে সেটাকে মুখের ভেতর টেনে নিল।

তীরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি আরেক রকমের তীর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওটা কেঁচো কিংবা তেলাপোকা ছাড়া অন্য কিছু হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। তারপরেও ওটারই একটা চট করে তুলে ধনুকে সেট করে ট্রিগার চেপে দিলাম খোক্ষসটার বুক বরাবর তাক করে।

খোক্ষস ততক্ষণে অবশ্য ব্যাঙ বাবাজিকে উধাও করে আমার দিকে লাফ দিয়েছে। কী হতে কী হলো বোঝার আগেই দেখি দানব ছিটকে গিয়ে দীঘির কাছাকাছি গিয়ে পরেছে। আর দানবটার বুকের ওপর একটা ইয়া মস্ত এক কুমীর বসে আছে। আমি আর দেরি করতে রাজি নই। ওরকম আরেকটা তীর সেট করে ছুঁড়ে দিলাম খোক্ষসটার মুখ বরাবর।

তারপর উল্টে ঘুরে দৌড় দিলাম সেদিকে, যেখানে উড়ুক্কুকে রেখে এসেছি। হাতে ইন্ডিকেটরটাও নেই। কখন যে হাত থেকে পরে গেছে কে জানে। এখন রাস্তা না হারালেই হয়। পেছনে কী অবস্থা সেটা ফিরে দেখবার সাহস কিংবা সময় কোনোটাই এখন নেই।

বেশ খানিকটা এলোমেলো দৌড়াবার পর উড়ুক্কুকে খুঁজে পেলাম। দেখি ব্যাটা নিশ্চিন্ত মনে ঘাস চিবুচ্ছে। আমি দৌড়ে একলাফে ওর পিঠের উপর চড়ে বললাম, তাড়াতাড়ি উড়াল দাও।

উড়ুক্কু নিরীহ গলায় বলল, 'এখনো মন মতো ঘাস খেতে পারিনি। আরেকটু খেয়ে নেই। এখানকার ঘাসগুলো খুবই তাজা আর টাটকা বলে মনে হচ্ছে।'

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'খোক্ষসটা এখানে চলে আসলে ওর কাছে আমাদেরকেও টাটকা আর তাজা বলে মনে হতে পারে।'

উড়ুক্কু উত্তেজিত গলায় বলল, 'খোক্ষসটা এদিকেই আসছে নাকি?'

আমি বললাম, 'তা জানি না– তবে খাদ্য হিসেবে ঘোড়া নাকি খোক্ষসদের প্রথম পছন্দ।' আর কিছু বলতে হলো না। উড়ুক্কু এক লাফে শূন্যে উড়াল দিল। আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

তিন

মহাধুমধাম করে রাজকন্যার সাথে বিয়ে হয়ে গেল আমার। মায়াপুরীর সব মানুষজনকে দাওয়াত করে খাওয়ালেন মহামান্য। বিয়ের উৎসব অনেক রাত অবধি চলতে লাগলো। বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে আমি যাকে

বিয়ে করেছি তাকে এখন পর্যন্ত দেখার সুযোগ হয়নি আমার। তবে সবার মুখে রাজকন্যার রূপের বেশ প্রশংসা শুনেছি। তাই রাজকন্যাকে দেখার বেশ কৌতুহল হচ্ছিল। তাই সময় সুযোগ মতো বাসরঘরে চলে এলাম। রাজকীয় সাজে সজ্জিত বাসর ঘর। মাঝে রাজকন্যা ঘোমটা দিয়ে আমার অপেক্ষায়। আমি তার কাছাকাছি গিয়ে বললাম, 'ভালো আছেন?'

রাজকন্যা জবাব দিল না। আমি খুক করে একটা শুকনো কাশি দিয়ে বললাম, 'কারও চেহারা না দেখে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি না। আপনি কী ঘোমটাটা একটু তুলবেন?'

রাজকন্যা তার ঘোমটা তুলে দিল। কিন্তু ঘোমটা তোলার পর দেখি শাড়ি আর চুড়ি হাতে পুকুরের সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো বসে আছে। বুড়োর দাড়িতে এখনও সেই ছিপের দড়ি পেঁচিয়ে আছে, হুকটাও বোধহয় খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে।

বুড়ো আমাকে দেখেই দাঁত বের করে একটা বিদঘুটে হাসি দিয়ে বললো- 'কিহে, তোমার অ্যাকুরিয়াম কোথায়? আমাকে দেখিয়ে ব্যবসা করবে না?'

কিসের ব্যবসা? অজানা ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে বাসরঘর থেকে এক দৌড়ে বের হয়ে এলাম আমি। দেখি বুড়োও আমাকে ধরার জন্য শাড়ি-চুড়ি নিয়ে ছুটে আসছে। আমার কানের কাছে তখন কে যেন শুধু বলছে, 'পালাও...পালাও...!!'

ছুটতে ছুটতে একসময় দেখি উড়ুক্কু আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একলাফে গিয়ে উড়ুক্কুর পিঠে চেপে তাড়াহুড়ো করে বললাম, 'আমাকে পৃথিবীতে পৌছে দাও।'

উড়ুক্কু নির্বিকার কণ্ঠে বললো, 'যেতে পারি কিন্তু মিটারের চেয়ে বিশ টাকা বাড়িয়ে দিতে হবে।'
জবাবে কী বলেছিলাম মনে নেই। শুধু দেখলাম– উড়ুক্কু একলাফে শূণ্যে ডানা ভাসিয়ে দিল।

চার

উড়ুক্কু চমৎকারভাবে আমাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তবে ভাড়া নেয়নি। বলল, পরে একসময় এসে নিয়ে যাবে। আমারও খুব এলোমেলো লাগছিল– তাই বেশি কথা বাড়াইনি।

বাড়ির দরজা খোলা দেখে অবাক হলাম। যতদূর মনে পরে দরজায় তালা দিয়েই মাছ ধরতে বেড়িয়েছিলাম। তাহলে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো কে?

বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই এক অপূর্ব রূপসী আমার পথ আগলে দাঁড়াল।

হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে আপনি? তালা-চাবি মিস্ত্রী নাকি? চাবি ছাড়া বাড়িতে ঢুকলেন কিভাবে?'

মেয়েটা আমার কথা শুনে একরাশ হাসি ছড়িয়ে দিল চারপাশে। মোহনীয় রূপের মতোই অপূর্ব তার হাসি। কিন্তু আমি খুবই বিরক্ত হবার ভাব ধরে বললাম, হাসছেন কেন? আমি কী হাসির পাত্র?

মেয়েটা আরও মিষ্টি করে হেসে বলল, 'না তুমি হাসির পাত্র হতে যাবে কেন? তুমি হচ্ছো সিরিয়াস পাত্র।'

আমি এবার সত্যিই বিরক্ত হলাম, 'ভনিতা রেখে বলুন, কে আপনি?'

মেয়েটা এবার হাসি থামিয়ে বলল, 'তুমি এতই সিরিয়াস পাত্র যে, গতকাল বিয়ে করে আজ নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারছ না।'

কথা শেষ হতে না হতেই আবার হাসি শুরু হয়ে গেল। এ সময় কোথা থেকে একটা ঘুম ঘুম ভাব যেন আমাকে জড়িয়ে ধরলো। মেয়েটির মোহনীয় সেই হাসির শব্দে ঘুমটা আরও গাঢ় হয়ে উঠতে শুরু করল আমার।

ভুতু ভুতুম

এক

ঝুম সন্ধ্যাবেলা। একটা অশ্বথ গাছের ডালে বসে ভুতু কাঁদছে। কান্নার সাথে সাথে ভুতুর চোখ দিয়ে একের পর এক বাবল বেড়িয়ে আসছে। ভুতেরা কাঁদলে মানুষের মত তাদের চোখ দিয়ে মোটেও জল বের হয় না। বের হয় সাবানের ফেনার ফেনার মত বুদবুদ মানে বাবল। ছোট্ট ভুতুর কান্না শুনে ভুতুর বড়ভাই ভুতুম সেখানে এসে হাজির হল।

ভুতুম: কিরে ভুতু, এই সন্ধ্যাবেলা কান্না করছিস কেন? কি হয়েছে?

ভুতু: ভাইয়া, টোপন আমকে কার্টুন দেখতে দেয় নাই।

ভুতুম: টোপনটা কে? কোন দুষ্ট রাক্ষস?

ভুতু: না ভাইয়া, টোপন ঐ লাল বাড়িটার তিনতলায় থাকে। আর সারাদিন কার্টুন মুভি দেখে।

ভুতুম: তাহলে তোকে কার্টুন দেখতে দেয় নাই কেন?

ভুতু: বিকেলবেলা ওদের বাসার জানালা খোলা ছিল। জানালার বাইরে থেকে টোপনের সাথে আমিও কার্টুন দেখছিলাম। কিন্তু ও আমাকে দেখতে পেয়ে ভয়ে জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিয়েছে।

ভুতুম: হুম! তাহলে তখন অন্য কোন বাসার টিভি দেখতি...

ভুতু: ভাইয়া, সবাইতো আর টোপনের মত কার্টুন দেখে না।

ভুতুম: হু! আচ্ছা আর কান্না করিস না। চল তোকে কার্টুন দেখিয়ে নিয়ে আসি।

ভুতু: সত্যি ভাইয়া?

ভুতুম: হুম সত্যি!

দুই

ভুতু আর ভুতুম দাড়িয়ে আছে শওকাত সাহেবের বাসার সামনে। ভুতুম হাত বাড়িয়ে কলিংবেল টিপে দেয়। একটু পরে দরজা খুলেন শওকাত সাহেবের স্ত্রী। মিসেস শওকাত দরজা খুলে ওদেরকে দেখেই ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন, 'মিতুর আব্বা, এ্যাই কোথায় তুমি? কারা যেন বাড়িতে ঢুকে পড়েছে!'

স্ত্রীর চিৎকার শুনে প্রায় সাথে সাথে শওকাত সাহেব একটা ম্যাগাজিন হাতে ছুটে আসলেন। চোখে মুখে খানিকটা বিরক্তির রেখা। সন্ধ্যাবেলা অন্য কোন কাজ না থাকলে শওকাত সাহেব নানান পত্র-পত্রিকা পরেন। সাধারণত এসময় তাকে কেউ ডাকাডাকি করলে ভীষণ বিরক্ত হন। কিন্তু আজকে কেন যেন স্ত্রীর চিৎকারে এক

রকমের আতঙ্কের ছোঁয়া দেখে আজকে উঠে আসতে দেরি করেননি। দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই বরফের মত জমে গেলেন শওকাত সাহেব, 'কে-ক্কে-কারা তোমরা? এখানে কী চাও?'

ভুতুম একটু হালকা কেশে নিয়ে গলাটা পরিস্কার করে নিয়ে বলল, 'জ্বী, আমার নাম ভুতুম আর ও আমার ছোটভাই ভুতু। আসলে ভুতু একটু টিভিতে কার্টুন দেখতে চাচ্ছিল। আপনাদের টিভিতে কি কার্টুন দেখা যাবে?'

শওকাত সাহেব একটু ধাতস্ত হয়ে তার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। কিন্তু মিসেস শওকাত কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। তবে তার চোখে মুখে না ভাবটা স্পষ্ট ফুটে উঠছে। শওকাত সাহেব ওদের দিকে তাকিয়ে অনুমান করলেন, যেই চেহারা আর আকৃতি নিয়ে এরা এসেছে তাতে করে এদেরকে মানুষ ভাবার কোনো উপায় নেই।

কোন অশরীরী আত্মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে কখন কি বিপদ ঘটে যায় কে বলতে পারে। তাই ভয়ে ভয়ে আর না করতে পারলেন না। ওদের দিকে তাকিয়ে বলেলেন, 'আচ্ছা এসো, তোমরা ভেতরে এসো।'

ভুতু আর ভুতুম শওকাত সাহেবের বাসার ভেতরে ঢুকে ড্রইংরুমের সোফায় বসে পরলো। মিসেস শওকাত শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালে জমে যাওয়া ঘাম মুছতে শুরু করলেন। শওকাত সাহেব বুঝতে পারলেন উনার স্ত্রীর অবস্থা ভালো নয়। বেচারি মারাত্মক ভয় পেয়েছে। স্ত্রীকে ধরে বেডরুমের দিকে নিয়ে গেলেন তিনি। এই সময় ভেতরের রুমে থেকে বেড়িয়ে এলো শওকাত সাহেবের পাঁচ বছরের মেয়ে মিতু। ড্রইংরুমে ভুতু আর ভুতুমকে সোফায় বসে থাকতে দেখে বেশ অবাক হয়ে যায় সে, 'ওমা, তোমরা কারা? দেখতে এমন কেন? মাথায় শিং, কালো কালো চেহারা, চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা হাত-পা!'

ভুতুম: আমরা আসলে কার্টুন দেখতে এসেছি। তোমাদের টিভিতে কি একটু কার্টুন দেখা যাবে? ভুতুর কার্টুন দেখার খুব শখ।

মিতু: ভুতু কে?

ভুতুম: আমার পাশে যে মুখ গোমড়া করে বসে আছে সে হচ্ছে– আমার ছোট ভাই ভুতু আর আমার নাম ভুতুম।

মিতু: ও আচ্ছা আচ্ছা। তোমরা কার্টুন দেখতে চাও?

ভুতু আর ভুতুম এক সঙ্গে মাথা নাড়লো। মিতু টিভিটা অন করে রিমোট হাতে নিয়ে কার্টুন চ্যানেল এনে দিল। ভুতু আর ভুতুম মনোযোগ দিয়ে কার্টুন দেখতে শুরু করলো।

তিন

শওকাত সাহেবের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে গোফরান আর গাবলু। গোফরান দেখতে অনেকটা সরু পাটকাঠির মত। আর গাবলু বেশ মোটাসোটা। দু'জনেরই মুখেই ভয়ংকর রকমের মুখোশ। এটা অবশ্য তাদের ধারণা। আসলে তাদের মোটেও ভয়ংকর লাগছে না। লাগছে সার্কাসের ক্লাউনের মত। গোফরান আর গাবলু এসেছে শওকাত সাহেবের বাসায় ডাকাতি করতে। তাদের চেহারা খুবই সাদামাটা বলে কাউকে হুমকি-ধামকি দিলেও ভয় পায় না। তাই মুখোশ পরে ভয়ংকর ডাকাত সাজার চেষ্টা করছে। এসময় হঠাৎ

লোডশেডিং হতেই কথা বলে উঠল গাবলু, 'ওস্তাদ, মিটার মতিনের টাইমিং দেখছেন? এক্কেবারে টাইম মত লাইন অফ করে দিছে।'

স্বাস্থ্য সুবিধাজনক না হওয়াতে মুখোশটা ঠিকমতো মনে হয় মুখে ধরছিল না গোফরানের। তাই সে মুখোশটা হাত দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে দেখে বললো, 'হু, এবার কথা কম। চল ঝটপট ভেতরে ঢুকে পড়ি।'

গাবলু চিন্তিত হবার ভঙ্গিতে বলল, 'কলিংবেল টিপবো?'

গোফরান মহা বিরক্ত হয়ে বলল, 'দূর গাধা! আগে লক চেপে দ্যাখ, ওটা খোলা আছে কি-না। না হলে মাস্টার কী দিয়ে খুলতে হবে।'

গাবলু লক চেপে ধরে ঘুরাতেই দরজা খুলে গেল। ভুতু আর ভুতুম আসার পর শওকাত সাহেব সম্ভবত দরজা লক করতে ভুলে গিয়েছিলেন। ভেতরে ঢুকেই টর্চ জ্বালাবে গোফরান। এ সময় মৃদু স্বরে চেঁচিয়ে উঠে গাবলু, 'ওস্তাদ, সোফায় দুইটা অ্যান্টিক মূর্তি আছে। মনে হয় কষ্টিপাথরের। এই মূর্তি দুইডা লইয়া যাই। আর কিছু লাগবো না।

গোফরান: আরে থাম ব্যাটা! নগদ কিছুর দরকার আছে। পকেটে একটা টাকাও নাই। রাতে কী কষ্টিপাথর খাবি?

গাবলু: কেন? এখান থেকে খেয়ে যাব!

গোফরান: চুপ গাধা! এটা কী তোর শ্বশুরবাড়ি নাকি?

এসময় চার্জার লাইট হাতে শওকাত সাহেব ড্রইংরুমে আসতেই মুখোশধারী গাবলু আর গোফরানকে দেখে আবারো চমকে উঠলেন তিনি, 'কে-ক্কে-কে কারা এখানে? তোমরাও কী কার্টুন দেখতে চাও নাকি? এখন তো কারেন্ট নেই। পরে এসো।

গাবলু: কার্টন-ফার্টন কি বলে ওস্তাদ? কার্টন বক্সে করে টাকা দেবে?

গোফরান একটা খেলনা পিস্তল শওকাত সাহেবের দিকে তাক করে বললো, 'দেখুন, আমরা কোন কার্টন চাই না। আমরা চাই টাকা। জলদি সব টাকা বের করুন। না হলে এক গুলিতে খুলি উড়ে যাবে।'

শওকাত সাহেব আরো হতভম্ভ করে দিয়ে গাবলু আরো একটা খেলনা পিস্তল বের করে বললো,'ওস্তাদ কী বলছে বোঝেন না! পিস্তলের গুলির যে দাম, কিনতে পারি নাই। তাই খালি পিস্তল নিয়ে চলে আসছি। আমাদের আবার টাকা পয়সার একটু শর্ট আছে কি-না।'

গোফরান: চুপ কর হাবলু কোথাকার! আমাদের পিস্তলে গুলি নাই– এটা আগেই বলে দিলে ডাকাতি করবি কিভাবে?

গাবলু: তাহলে কী কথাটা পরে বলব, ওস্তাদ?

গোফরান: তুই পিস্তল তুলে চুপ করে থাক। যা করার আমি করছি।

চার

একটু পর। শওকাত সাহেব, মিসেস শওকাত আর মিতুর দিকে পিস্তল ধরে রেখেছে গাবলু। এদিকে গোফরান আলমিরা খুলে টাকা আর স্বর্ণাংলংকার বস্তায় ভরতে শুরু করেছে। কাজ শেষে তিনজনকে বেডরুমের ভেতর রেখে দরজা লক করে দিয়ে চাবিটা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিল গোফরান। কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাবলুকে দেখতে পেল না। মহাবিরক্ত হয়ে কিরমির করে উঠল গোফরান, 'গাবলু, এ্যাই গাবলু!'

এ সময় বেডরুমের ভেতর থেকে আওয়াজ ভেসে আসে গাবলুর, 'ওস্তাদ আমি তো এখানে!'

'তুই ভেতরে কী করছিস বেত্তমিজ কোথাকার? বেড়িয়ে আয়।'

'ওস্তাদ, দরজা তো বন্ধ। বের হব কিভাবে?'

মেজাজটাই বিগড়ে গেল গোফরানের। এখন এই অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া চাবি খুঁজতে যাওয়া কী চাট্টিখানি কথা! টর্চের আলোও কমে গেছে। কিছুই ঠিকমত দেখা যাচ্ছে না। এর মধ্যে অন্ধকারে কোথায় যেন এক ভীম গুঁতো খেয়ে মাথায় একটা ঢাউস বেলুন ফুলে গেল গোফরানের। এ সময় পায়ের কাছে হালকা রিনরিন আওয়াজ হতেই মেঝেতে মেঝেতে হাতড়ে হাতড়ে চাবিটা পেয়ে গেল গোফরান।

দরজা খুলতেই দেখা গেল গাবলু ঘেমে গোসল করে ফেলেছে। সব বস্তা কাঁধে নিয়ে শওকাত সাহেবের বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় গোফরানকে জিজ্ঞাসা করল গাবলু, 'ওস্তাদ, বড় একটা বস্তা খালি আছে। কষ্টিপাথরের মূর্তি দুইটা নিয়া নেই?'

গোফরান তার কপালের একপাশে ফুলে ওঠা বেলুনে হাত বুলিয়ে বলল, 'যা করবি তাড়াতাড়ি কর।'

গাবলু বস্তা হাতে নিয়ে ড্রইংরুমের ভেতরে ঢুকে পড়লো। কিন্তু ফিরে আসার কোন নাম-গন্ধ নেই। এক দুই করে চার মিনিট হয়ে গেল। গাবলুর নাম ধরে ডাকাডাকি করেও সাড়া পেল না গোফরান। কী আর করা। বাধ্য হয়ে নিভু নিভু টর্চটা জ্বেলে ড্রইংরুমের সোফার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ড্রইংরুমে কেউই নেই। মূর্তি দুটো আগের মতই সোফায় পরে আছে। মেঝেতে কিছু একটা নড়ে উঠতেই গোফরান টর্চ ফেলে দেখলো, বস্ত াটা ভীষণ রকম ফুলে আছে। আর ভেতরে কী যেন নড়াচড়া করছে একটু পর পর।

গোফরান: গাবলু! অ্যাই গাবলু।

গাবলু: ওস্তাদ, আমি এখানে।

গোফরান: কই, কোথায় তুই?

গাবলু: ওস্তাদ, আমি তো বস্তায়।

গোফরান: বেকুব কোথাকার! তুই বস্তায় ঢুকলি কিভাবে?

গাবলু: জানি না ওস্তাদ। কষ্টিপাথরের মূর্তি বস্তায় নিতে গিয়ে দেখি আমি নিজেই বস্তার ভেতরে ঢুকে গেছি। বস্তার মুখটাও মনে হয় সেলাই করে দিছে।

গাবলুর কথা শেষ হবার আগেই ভুতু ছুটে এসে গোফরানের হাতে কামড় দিয়ে বসে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে হাত থেকে টর্চ ফেলে দেয় গোফরান। আলো নিভে গিয়ে অন্ধকার হয়ে যায় চারপাশ।

পাঁচ

ড্রইংরুমে সবাই বসে আছে। শওকাত সাহেব, মিসেস শওকাত, মিতু, ভুতু আর ভুতুম। মোবাইল ফোনে শওকাত সাহেব আগেই ফোন করেছিলেন থানায়। পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে গাবলু আর গোফরানকে।

ভুতুম: অনেক রাত হয়ে গেল। কারেন্ট বোধহয় আসতে আরো দেরি হবে। আমরা বরং আজ যাই।

ভুতু: কিন্তু ভাইয়া, আমার তো কার্টুন দেখাই হলো না।

শওকাত সাহেব: তোমরা কার্টুন দেখতে আজকে না এলে সর্বনাশ হয়ে যেত। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের। যখন ইচ্ছা হবে তখনই কার্টুন দেখতে চলে এসো। অনেক খুশি হবো আমরা।

মিসেস শওকাত: তোমাদের শুরুতে দেখে আমি বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিছু মনে কর না।

মিতু: তোমরা এখন থেকে আমার বন্ধু। কি আসবে না তোমরা?

ভুতু: হ্যাঁ, অবশ্যই আসবো।

ভুতুম: আচ্ছা মিতু, আজ আসি তাহলে। কার্টুন দেখানোর জন্য ধন্যবাদ তোমাকে। ভালো থেকো।

শওকাত সাহেবের বাসা থেকে বের হয়ে ভুতু আর ভুতুম আস্তে আস্তে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

পরী

এক

অসহ্য এক দুপুরবেলা।

মাঝে মাঝে এরকম দুপুর পাওয়া যায়। যে দুপুরে প্রায় সবকিছুই অসহ্য বলে মনে হয়। যেমন এই মুহূর্তে টিভিটাকে মোফাজ্জল করিমের কাছে একটি অসহনীয় বস্তু বলে মনে হচ্ছে। পর্দায় একেক সময় একেকজন মানুষ চলে আসছে। তারা কী সব বলে আবার চলেও যাচ্ছে। টিভি দেখায় আসলে মোটেও মন নেই মোফাজ্জল করিমের। বাইরে প্রচন্ড রকমের রোদ পড়েছে আজকে। মাথার উপর অবশ্য একটা ফ্যান ঘুরে যাচ্ছে অবিরাম। কিন্তু খুব একটা কাজ হচ্ছে না। ফ্যান চলা অবস্থাতেও দরদর করে ঘামছে মোফাজ্জল। গোসল করার পর অবশ্য গায়ে একটা শার্ট চাপিয়ে সে টিভি দেখতে বসেছিল। কিন্তু গরমের কারণে সেটা খুলে রেখেছে। স্যান্ডো গেঞ্জিটাও খুলে ফেলবে কিনা ভাবছিল, এমন সময় তাকে প্রায় চমকে দিয়ে কলিংবেল বেজে উঠলো।

এই অসহ্য গরমের মধ্যে যেন একটা ঘুম ঘুম ভাব চলে এসেছিল। কলিংবেলের শব্দে সেই ঘুম পুরোপুরি কেটে গেল। এই দুপুরবেলা তার কাছে কে আসতে পারে। তার কোন কাছের বন্ধু-বান্ধব নেই যে ছুটির দিনে তার সাথে গল্প করতে চলে আসবে। আর আসতে পারে বাড়িওয়ালি। কিন্তু আজকে মাসের ছাব্বিশ-সাতাশ তারিখ হবে। বাড়ি ভাড়ার জন্য বাড়িওয়ালি পাঁচ তারিখের আগে বিরক্ত করবে না।

মোফাজ্জল মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেল যে, সে ভুল শুনেছে। কলিংবেলটা আসলে বাজেনি। গরমে মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। অথবা কলিংবেলটার লাইন ডাইরেক্ট হয়ে গেছে, তাই নিজে নিজেই বেজে উঠেছে। ওটাকে বদলাতে হবে। এসব ভাবতে ভাবতেই পর পর আরও দু'বার বেজে ওঠে কলিংবেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মোফাজ্জল দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ছিটকানিটা নামিয়ে দরজা খুলে খানিকটা চমকে যায় সে।

দরজার ওপাশে একটা মেয়ে দাড়িয়ে আছে। সাধারণ মেয়ে হলে এক কথা ছিল কিন্তু এই মেয়ে দেখতে অস্বাভাবিক রূপসী। এত রূপ কোন মানুষের হয় না। অসম্ভব রূপবতী মেয়েদের চেহরায় এক রকমের স্টেইনলেস স্টিল টাইপ কাঠিন্য থাকে। কিন্তু এই মেয়ের চেহারায় সেটা নেই। দেখলেই কেমন যেন মায়া মায়া লাগে।

দরজা খুলতেই মেয়েটা বলল, 'আপনিই কী মোফাজ্জল করিম?' মোফাজ্জল মাথা নাড়তেই মেয়েটা আবার বললো, 'আপনার সাথে কিছু জরুরি কথা আছে। আমি কী ভেতরে আসতে পারি?'

জবাবে মোফাজ্জল কিছু বলল না। কিন্তু মেয়েটা সেটা লক্ষ্য না করেই ভেতরে গিয়ে বসলো। দরজাটা কোনোভাবে চাপিয়ে একপাশে পরে থাকা অর্ধ ঘামে ভেজা শার্টটা টেনে নিয়ে মেয়েটার মুখোমুখি হলো মোফাজ্জল।

মেয়েটা তার হাতের চুড়িগুলোতে একরাশ শব্দ তুলে বললো, 'দেখুন আমি যে কোনো বিষয়ে সরাসরি কথা বলতে পছন্দ করি। আশা করি আমার কথাগুলো আপনি গুরুত্ব সহকারের শুনবেন। আমি মানুষ নই। পরী। সত্যিকারের পরী। রূপকথার পরীদের ডানা থাকে। সত্যিকারের পরীদের ডানা থাকে না।'

মেয়েটা এসব কী বলছে? তার কী এসব কথা বিশ্বাস করা উচিত হবে–মোফাজ্জল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

মেয়েটা এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'দেখুন মোফাজ্জল সাহেব, আমি অনেক বিপদে পড়েই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। মানুষের মাঝে যেমন ভালো-মন্দ রয়েছে তেমনি রয়েছে আমাদের মাঝেও। পরীদেশে কিছু ভয়ানক বাজে পরীও আছে। এরকম এক পরীর নাম জিন্দান পরী। সে দেখতে যেমন নোংরা ও কুৎসিত; আচার-আচরণেও তেমনি। সেই জিন্দান পরী আমাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আমি তাতে মোটেও রাজি নই। আর আমার হয়ে জিন্দানকে তাড়িয়ে দেবে এমন কোন শুভাকাঙ্খী পরী দেশে নেই। থাকলেও জিন্দানের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবে এমন সাহস কারও নেই। তাই তার কাছ থেকে বাঁচতে হলে আমাকে পালাতে হবে। নইলে জোর করে জিন্দান আমাকে বিয়ে করে ফেলবে।

আমরা পরীরা মানুষের চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতা রাখি। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে চাইলেই কথা বলতে পারি, অবস্থান বের করতে পারি। কিন্তু জিন্দান আর দশটা স্বাভাবিক পরীর মতো না। ওর মধ্যে খানিকটা সমস্যা আছে। কৃষ্ণপক্ষের রাতে জিন্দানের যে অনুভূতি শক্তি কাজ করে শুক্লপক্ষের রাতে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ মাসের পনের দিন সে আমার খবর বের করতে পারে না। কিন্তু বাকি পনের দিন আমার বেঁচে থাকাটা অসম্ভব করে দেয়। যেখানে সেখানে সে আমাকে বিরক্ত করে। কিন্তু আমি ওর হাত থেকে মুক্তি চাই। সেই মুক্তির উপায় হচ্ছেন আপনি।'

পরী মেয়েটার কথা শুনে মোফাজ্জল কিছুতেই বুঝতেই পারল না জিন্দানের মত ভয়ংকর পরীর হাত থেকে তাকে কিভাবে রক্ষা করবে। মেয়েটা হেসে বলল, 'আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখন শুক্লপক্ষ চলছে। আমি কোথায় আছি এটা জিন্দান এখন জানবে না। পুরো একটি কৃষ্ণপক্ষ যদি আমি লুকিয়ে থাকতে পারি, তা হলে পরী দেশের নিয়ম অনুযায়ী জিন্দান আর আমাকে বিয়ে করতে পারবে না।'

মোফাজ্জল মাথা চুলকে বলল, 'তারমানে আপনি আমার বাসায় লুকিয়ে থাকতে চান?'

মেয়েটা মাথা নেড়ে জবাব দিল, 'চাই। তবে সেটা আপনার বাসার কোনো ফর্নিচারের আড়ালে নয়, আপনার মাঝে।'

মোফাজ্জল হতভম্ব হয়ে বলল, 'মানে?'

মেয়েটা বলল, 'মানে খুব সিম্পল। পরীদের নিয়ম অনুযায়ী মেয়ে পরী শুধুমাত্র কোন পুরুষ মানুষের উপর ভর করতে পারে অর্থাৎ আপনার অস্তিত্বের আড়ালে আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারি।'

মেয়েটার কথা শুনে মুখ হা হয়ে গেল মোফাজ্জলের।

'পরীরাজ্যের তথ্যকেন্দ্রে পৃথিবীর সব মানুষের সম্পর্কেই তথ্য রয়েছে। সেই তথ্য থেকে দেখা গেছে আপনি মোটামুটি একজন নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। একা থাকেন। আপনার সম্পর্কে অন্যান্য তথ্যগুলোও আমার পছন্দ হয়েছে। আমাকে আপনার পছন্দ হয়েছে তো?'

পরী মেয়েটার কথা শুনে মোফাজ্জল কী বলবে বা বলা উচিত সেটাই ভেবে বের করতে পারে না। তবুও কিছু একটা বলতে হয় ভেবে বলে ফেলে, 'চা খাবেন?'

তার কথা শুনে খুবই বিরক্ত হয় মেয়েটা, 'এই গরমে কেউ চা খায়? একটু শরবত খাওয়াতে পারেন।'

পরীর শরবত খাওয়ার কথা শুনে মোফাজ্জলের মনে পড়ে ঘরে চিনি নেই। মোফাজ্জলের তেতো চেহারা দেখে পরী উঠে দাঁড়ায়, 'থাক আপনাকে আজ আর শরবত খাওয়াতে হবে না। আমি আমার ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ নিয়ে কাল সকালেই চলে আসবো। এসে আপনাকে শরবত বানিয়ে খাওয়াবো।'

মেয়েটা উঠে দাঁড়াতেই মোফাজ্জলও উঠে দাঁড়ায়, 'ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ মানে?'

মেয়েটা অবাক হয়ে বলে, 'কী ভেবেছেন, আমি পরী বলে কী আমার পোশাক আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বলে কিছু নেই? আমি কি জলে ভাসা পদ্ম?'

মোফাজ্জল বুঝতে পারে মেয়েটা রেগে যাচ্ছে। সাধারণ মেয়ে হলে এর সাথে তর্ক করা যেত কিন্তু পরী জাতীয় মেয়েকে কিছু বলে রাগিয়ে দেওয়াটা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। রেগে গিয়ে জাদু করে মোফাজ্জলকে গরু-ভেড়া টাইপ কিছু বানিয়ে দিতে পারে চোখের পলকে।

সে মাথা নিচু করে বললো, 'জ্বী আচ্ছা। আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। অপরাধ মার্জনা করবেন।'

পরী চোখ মটকে বলল, 'হয়েছে, আমি যাচ্ছি। দরজাটা লাগিয়ে দিন।'

মেয়েটা চলে যেতেই দরজার ছিটকানিটা তুলে দিয়ে শার্টের সাথে সাথে স্যান্ডো গেঞ্জিটাও একটানে খুলে ফেলল মোফাজ্জল। দু'টোই ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে।

দুই

বিকেলবেলা অফিস থেকে ফেরার সময় মোফাজ্জলের মনে পরলো একটু লন্ড্রিতে যাওয়া দরকার। কাপড়গুলো আনা হচ্ছে না।

লন্ড্রির দোকানদার লিটন মিয়া তাকে দেখেই একটা বাঁকা হাসি দিয়ে বসলো। অবশ্য সে চাইলেও মনে হয় সোজা হাসি হাসতে পারে না। তার সব রকম হাসিই বাঁকা। দেখেই শরীর জ্বলে যায়– এই টাইপ হাসি। মোফাজ্জলের অবশ্য এমন হাসি নিয়ে কোন মাথাব্যাথা নেই। শুধু লিটনের মুখের পানের রস গড়িয়ে কাপড়ের মাঝে না পরলেই হলো।

সবসময়ই লোকটা মুখ লাল করে পান চিবোয়। তাকে দেখেই লিটন মিয়া একগাদা পানের পিক ফেলে বলল, 'ভাইজান কেমুন আছেন?'

মোফাজ্জল ক্লান্ত স্বরে বলল,' হ্যাঁ ভালো। কাপড়গুলো দিন।'

ভাঁজ করা কাপড়গুলো দিতে দিতে লিটন মিয়া বলল, 'ভাইজান, আপনার বারান্দায় দেখলাম মাইয়া মাইনসের কাপড়; বিয়া করলেন কবে?'

কথাটা শুনে মনে মনে ভীষণ চমকে উঠে মোফাজ্জল, বলে কী ব্যাটা?

কিন্তু কথাটা না শোনার ভান করে কাপড়গুলো নিয়ে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাসার দিকে রওনা দেয় সে।

পরী মেয়েটা সেদিনের পর থেকে নানান যন্ত্রণা শুরু করেছে। মেয়েটা যাতে ঝামেলা করতে না পারে সে জন্য প্রথমদিনই বাসা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল মোফাজ্জল। কিন্তু পালিয়ে গিয়ে খুব একটা লাভ হয়নি। কয়েকদিনের জন্য দূর সর্ম্পকের এক আত্মীয়র বাড়িতে চলে গিয়েছিল মোফাজ্জল। কিন্তু বাসায় ফিরে মোফাজ্জল দেখে, পরী মেয়েটা ভেতরে ঢুকে বসে আছে। বাইরে থেকে দরজা লক থাকার পরেও মেয়েটা কিভাবে ভেতরে ঢুকেছিল কে জানে!

বাসায় ফেরার পর মেয়েটা যেভাবে তার দিকে তাকিয়েছিল তাতে করে বাড়তি কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস মোফাজ্জলের হয়নি। আজকে আবার বারান্দায় কাপড় ঝুলিয়ে দিয়েছে। আশেপাশের সবাই জানে– সে ব্যাচেলর। এখন বারান্দায় মেয়েদের কাপড় ঝুললে তো সবাই তার দিকে তাকিয়ে লিটনের মতো বাঁকা হাসি দিতে শুরু করবে।

খুব টেনশন কাজ করছিল। সিঁড়ি দিয়ে তাড়াহুড়ো করে উপরে উঠে যাচ্ছিল মোফাজ্জল। দোতালায় আসতেই ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল। মোফাজ্জল সেদিকে না তাকিয়েই উপরে উঠে যাচ্ছিল। আগেও খেয়াল করে দেখেছে, সে দোতালায় আসলেই কেমন করে যেন দরজাটা খুলে যায়। আর সব সময়ই দরজাটা খোলে ঊর্মি, বাড়িওয়ালীর বড় মেয়ে। কিন্তু কী কারণে যে এমনটা হচ্ছে সেই রহস্য মোফাজ্জলের উদ্ধার করা হয়নি।

'মোফাজ্জল ভাই শুনুন', ঊর্মির পেছন থেকে ডাক দেয়।

'আরে ঊর্মি, কেমন আছ?'

'এই তো আছি, খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে আপনাকে...'

'হ্যাঁ, মাত্র অফিস থেকে ফিরলাম তো।'

'একটু চা খেয়ে যান।'

'না ঊর্মি, আরেকদিন। খালাম্মা কোথায়? বাইরে?'

'হ্যাঁ'– বলেই ঊর্মির মুখটা কেমন যেন বিষণ্ন হযে গেল।

মা বাসায় না থাকলেই মেয়ে কেন যে তাকে চা খাওয়াতে চায়– কে জানে!
বাসায় ঢুকেই মোফাজ্জলের ক্লান্তি সব দূর হয়ে গেল। ঘরের এপাশে-ওপাশে পরে থাকা সিগারেটের ফিল্টার, মুঠো পাকানো কাগজের স্তুপ কিংবা ঘরের কোণায় মাকড়শার আস্তানা কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এ সময় পরী এসে হাতে চা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুনতো চা কেমন হয়েছে? আমি এর আগে কখনো কোন মানুষকে চা বানিয়ে খাওয়াইনি।'

পরীর কথাটা শুনতে মোফাজ্জলের কেমন কেমন যেন লাগে।

মোফাজ্জল ভেবেছিল বারান্দায় কেন এত কাপড় ঝোলানো হয়েছে এজন্য পরীকে একগাদা কথা শোনাবে। কিন্তু চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সে চুপচাপ চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে।

পরী তার চোখে চোখ রেখে বলল, 'কোনো সমস্যা? চা সংক্রান্ত নাকি অন্যকিছু?'

মোফাজ্জল চায়ের কাপটা পরীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'না আসলে আপনি বারান্দায় কাপড় দিয়েছেন সেটা লোকজনের চোখে পড়ছে তো তাই।'

পরী একটু ভেবে বলল, 'এটা কোনো সমস্যাই না। কাল থেকে কাপড়ের সঙ্গে তুনতুনা ক্লিপ লাগিয়ে দেব।'

মোফাজ্জল জিজ্ঞাসা করলো, 'তুনতুনা ক্লিপ কি?'

মেয়েটা বললো, 'এটা পরী দেশের ক্লিপ। এটা দিয়ে কাপড় শুকাতে দিলে আমার কাপড় আর বাহিরে থেকে চোখে পরবে না। পরীর কথা শুনে মোফাজ্জল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।'

তিন

সেদিন রাতে মোফাজ্জলের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। এরকমটা মাঝে মাঝেই হয়। তখন খুব অস্বস্তি লাগে। বিছানা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে বসলো মোফাজ্জল। একটা সিগারেট ধরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো। সিগারেটে কয়েক টান দেওয়ার পর দেখা গেল কেমন করে যেন পুরো সিগারেটটা ভিজে আগুন নিভে গেছে।

মোফাজ্জল হাতেরটা ফেলে দিয়ে প্যাকেট খুলে আরেকটা আরেকটা ধরায়। কয়েক টান দেবার পর সেটারও একই অবস্থা।

'কষ্ট করে আর ধরাবেন না, সবগুলোই নিভে যাবে', পরীর কণ্ঠ শুনে খানিকটা চমকে যায় মোফাজ্জল।

'এত রাতে আপনি ? ঘুমাননি?'

'ঘুমাচ্ছিলাম সত্যিই। কিন্তু আপনার ধূম্রশলাকার কারণে উঠে আসতে হলো। আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। বাসায় অ্যান্টি স্মোকিং কিট সেট করে দেওয়া হয়েছে। সিগারেট, মশার কয়েল, কাগজ বা যে কোনো কিছুই পুড়তে থাকলে সেটাকে অ্যান্টি স্মোকিং কিট সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দেবে। খুবই কাজের জিনিস। পরীদেশে পাঁচ বছরের ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়।'

পরীর লেকচার শুনে মোফজ্জলের বিরক্তি ধরে গেল। বাসায় বসে শান্তিতে সিগারেট খাওয়াটাও এই পরী মেয়েটার কারণে বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

'মোফাজ্জল সাহেব, কিন্নরী সংগীত শুনবেন? আমি খুব ভালো কিন্নরী সংগীত জানি।'

পরীর কথা শুনে মোফাজ্জল তার কণ্ঠে খানিকটা বিরক্তি নিয়ে বলে, 'কিন্নরী সংগীত কী?'

পরী তার কথার জবাব না দিয়ে বারান্দায় রেলিংয়ের উপর উঠে বসলো।

মোফাজ্জলের একবার মনে হলো, এভাবে কেউ বসলে যে কোনো সময় নিচে পরে যাবার সম্ভাবনা আছে। বসতে নিষেধ করবো নাকি! আবার মনে হলো, পরীদের এভাবে বসলে নিশ্চয়ই খুব একটা সমস্যা হয় না।

আর যারা শূন্যে উড়তে পারে তারা উপর থেকে পরে গেলেও তো কিছু হবার কথা নয়। তবে মোফাজ্জল কখনো পরীকে উড়তে দেখেনি।

পরী তার পা ভাঁজ করে দু'হাতে হাটু জড়িয়ে নিয়ে গান গাইতে শুরু করলো। অদ্ভুত এক অপার্থিব সংগীত। পরীর কণ্ঠ যেন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে। মায়ার বাঁধনে বেঁধে নিচ্ছে পুরো পৃথিবীকে। পরীর মাথার পেছনে ধবধবে সাদা চাঁদ। আচ্ছা চাঁদটা কী এতক্ষণ এখানে ছিল? নাকি পরীর গান শুনতে এসেছে।
একটু আগেও তো আকাশটা অন্ধকার ছিল। ব্যাপারটা ঠিক মেলাতে পারে না সে। ঠিক এ সময় বইতে শুরু করে বাতাস। ঝিরিঝিরি একটানা বাতাস। সে বাতাসে কেমন যেন মনমাতানো সুরভি। বাতাসে উড়তে শুরু করে পরীর শাড়ির আঁচল আর তার দীঘল কালো কেশ। পরী তার মাতাল করা কণ্ঠে গাইছে কিন্নরী সংগীত। এমনি এক স্বপ্নময় পরিবেশে চোখ বুজে আসে তার।

চার

কয়েকদিন পর।
মোফাজ্জল অফিস থেকে এসে ফ্রেশ হয়ে মাত্র ড্রইংরুমে বসেছে এমন সময় কলিংবেলের শব্দ। উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখা গেল বাড়িওয়ালি আর তার কন্যা ঊর্মি দাঁড়িয়ে আছে। সর্বনাশ! এই মহিলাতো এখন সবগুলো রুম নানান ছুতোয় ঘুরে ঘুরে দেখবে। পরী কোথায় কি করছে কে জানে!

মোফাজ্জল তাড়াতাড়ি সালাম দিয়ে বললো, 'স্লামালাইকুম খালাম্মা, কেমন আছেন? ভেতরে আসেন।'

বাড়িওয়ালী ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আর বল না বাবা। তোমার একটু খোঁজ-খবর নিব বলে– আসি আসি করেও আসা হয় না।

ঊর্মিতো তোমার কথা প্রায়ই বলে। তুমি সন্ধ্যায় টায়ার্ড হয়ে আফিস থেকে ফিরো শুনে তোমাকে আর ডিস্টার্ব করতেও ইচ্ছা করে না।'

মোফাজ্জল নার্ভাস ভঙ্গিতে বললো, 'না না খালাম্মা, কী বলেন, আপনার যখন ইচ্ছা করবে তখনই আসবেন।'

কথাটা বলেই মোফাজ্জল খানিকটা থেমে যায়। মনে হচ্ছে, কিছু একটা ঘটতে শুরু করছে এবং সেটা তার সামনে দাঁড়ানো মানুষ দু'জনের কেউই টের পায়নি। কী যেন তার মাঝে ঢুকে পরছে। সে অনুভব করে কেমন একটা অদম্য শক্তি এসে তার ভেতরটা দখল করে নিচ্ছে। যেন সারা শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু একসাথে ঘুরপাক খেয়ে এক জায়গায় জমতে শুরু করেছে। খানিক সময়ের জন্য টলে উঠে মোফাজ্জল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নেয়।

হুট করে যেমনি শুরু হয়েছিল আবার হুট করেই সেই অনুভূতিটা চলে যায়। মোফাজ্জল আনমনেই বুঝতে শুরু করে, বাড়িওয়ালি যে এত কথা বলছে তার কোনটাই তার মনের কথা নয়। তার আসল উদ্দেশ্য বাসার অবস্থা কী দেখতে আসা। অবশ্য ঊর্মির মনের অবস্থা এখানে ভিন্ন। মোফাজ্জলের প্রতি কেমন একটা দুর্বলতা যেন অনুভব করা যাচ্ছে ঊর্মির ভেতর থেকে।

বাড়িওয়ালী কথা বলতে বলতে বারান্দায় চলে এলেন। সেখানে পরীর কাপড় রয়েছে কিন্তু তুনতুনা ক্লিপের জন্য কিছুই দেখা যাওয়ার কথা নয়।

মোফাজ্জলও কখনো দেখতে পায়নি। কিন্তু আজকে তুনতুনা ক্লিপ থাকার পরেও সবই তার চোখে পড়ছে। বারান্দা থেকে ভেতরে রুমে আসতেই ওয়্যারড্রোবের উপর চোখ আটকে গেল বাড়িওয়ালীর। সেখানে পরীর কানের দুল, চুড়ি ও অন্যান্য টুকটাক অর্নামেন্টস্ পড়ে আছে।

গহনাগুলো দেখে বাড়িওয়ালীর চোখ কপালে উঠে গেল। বাড়িওয়ালি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই মোফাজ্জল নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে দিল, 'ওগুলো আমার মায়ের স্মৃতি। মা তো নেই তাই মাঝে মাঝে স্মৃতিগুলোই নাড়াচাড়া করি।' কথাটা বলে মোফাজ্জল নিজেই অবাক হয়ে গেল। এরকম একটা তাৎক্ষণিক মিথ্যা সে কিভাবে বলে দিল নিজেই ঠিক বুঝতে পারলো না। মোফাজ্জলের নির্জলা মিথ্যাটা বাড়িওয়ালী ধরতে না পারলেও ঊর্মি মিনমিন করে তার মাকে বলার চেষ্টা করছিল যে, 'গহনার ডিজাইনগুলো নতুন মনে হচ্ছে।'

ঊর্মির মা কথাটা খেয়াল করার আগেই মোফাজ্জলের মধ্য থেকে কী একটা অদৃশ্য কিছু ছুটে গিয়ে বাতাসে ভাসতে থাকা ঊর্মির কথার কম্পনগুলোকে সড়িয়ে অন্যদিকে নিয়ে গেলো। সাথে সাথে মনে হলো, ঊর্মিও ব্যাপারটা ভুলে গেছে। দ্বিতীয়বার সে আর বিষয়টা উচ্চারণ করলো না।

বাড়িওয়ালি আর ঊর্মি বিদায় নেওয়ার পর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মোফাজ্জল। যাক ভালোয় ভালোয় সব কিছু সামাল দেয়া গেছে। কিন্তু পরী মেয়েটা গেল কোথায়?

এ সময় তার শরীরের ভেতর থেকে খানিকটা বাতাস আর খানিকটা আলোর মতো কিছু একটা আলাদা হয়ে গিয়ে পরীর রূপ ধারণ করে ফেললো। বাতাসের কাঠামো থেকে পরী তার অস্তিত্বকে পুরোপুরি ফিরে পাবার পর তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে বললো, 'কেমন দেখলেন?'

চোখের সামনে এরকম কিছু একটা হুট করে ঘটে গেলে কিছুই বলা যায় না। মোফাজ্জলও বলতে পারলো না। কেবল পরীর দিকে তাকিয়ে রইলো অপলক।

মানুষের উপর অন্য কোন অস্তিত্বের ছায়া এসে পড়লে তার অনুভূতির সুর কেমন হতে পারে– সেটা মোফাজ্জল প্রথম অনুভব করেছিল সেদিন।

শুক্লপক্ষের সময় পার হয়ে যাবার শেষদিন পরী এসে বললো, এবার পুরো পনেরটা দিনে জন্য আমি আপনার মাঝে মিশে যাবো। পরীর কথা শুনে মোফাজ্জলের কেমন যেন লজ্জা লাগতে থাকে। পরীর অবশ্য সেই লজ্জা-টজ্জাকে কোন পাত্তা দিল না। নির্দ্বিধায় মিশে গেল মোফাজ্জলের মাঝে।

সেই দিন থেকে পরী মোফাজ্জলের মাঝেই রয়েছে। পরী মোফাজ্জলের ভেতরে চলে আসার পর থেকে অন্যরকম একটা ক্ষমতা অনুভব করছে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে অনেক দূরের মানুষের কথাও স্পষ্ট কানে ভেসে আসে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পেপারটা আনার জন্য আর কষ্ট করে দরজার কাছে যেতে হয় না। বিছানায় শুয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেই চলে আসে। রাতের বেলা ঘুমানোর আগে একটা তুড়ি বাজালেই লাইট অফ হয়ে গিয়ে সারা ঘরে একটা মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে পরে। অতিমানবিক এই ক্ষমতাগুলো জীবনকে যেন আরোও বেশি সহজ করে দিয়েছে। কিন্তু এই সহজ জীবনেও মোফাজ্জল মুখোমুখি হয়ে গেল তিনটি বিচিত্র ঘটনার।

ঘটনা এক

লন্ড্রি থেকে কাপড় নিয়ে মোফাজ্জল চলে আসবে এমন সময় লিটন মিয়া তার সেই বিখ্যাত বাঁকা হাসিটা মুখে ঝুলিয়ে নিয়ে বলল, 'কী ভাইজান, ভাবীরে যে আর দেহি না। রাগ কইরা বাপের বাড়ি চইলা গেল নাকি?'

লোকটার কী আর কোন কাজ নেই। সারাদিন তার বাসার বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকে! কথাটা শুনে একটা অদম্য আক্রোশ নিয়ে মোফাজ্জল তাকিয়ে ছিল লিটন মিয়ার দিকে। মুহূর্তেই কী হয়ে গেল-হাসি দিতে গিয়ে লিটনের বের হয়ে থাকা দাঁতগুলোতে চিড় ধরে গেল। পরে রক্ত-টক্ত বের হয়ে একাকার অবস্থা। সেই দিনের পর থেকে বাঁকা হাসি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল লিটনের।

ঘটনা দুই

কৃষ্ণপক্ষের বারোতম দিনের ঘটনা। অফিস থেকে বাসায় ফিরছে মোফাজ্জল। সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় আসতেই দরজা খুলে গেল এবং দরজা যথারীতি ঊর্মি দাড়িয়ে। মোফাজ্জল কিছু বলার আগেই ঊর্মি মুখ শুকনো করে বললো, 'মোফাজ্জল ভাই কেমন আছেন? দেখেই বোঝা যাচ্ছিল মেয়েটার মন খুব খারাপ। চট করে পেছনে হাত দিয়ে এক তোড়া গোলাপ নিয়ে এসে মোফাজ্জল ঊর্মির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'শুভ সন্ধ্যা, ঊর্মি।'

ঘটনা দেখে মেয়েটা পুরোপুরি কাঠ-পুতুল হয়ে গেল। এতটা আশা করেনি বোধহয়। আর মোফাজ্জল নিজেও সেটা ভাবেনি কখনো। ভাবনার বাইরের ঘটনাগুলো জীবনে মাঝে মাঝে ঘটে যায় কোন এক অনাকাঙ্খিত মুহূর্তে। তবে সেদিন ঊর্মির চোখে আনন্দঅশ্রু দেখে মোফাজ্জলের মনে হয়েছিল এমন অনাকাঙ্খিত মুহূর্তগুলো জীবনে বারবার আসে না কেন!

ঘটনা তিন

কৃষ্ণপক্ষের শেষ দিন হঠাৎ সকালবেলা পরী কথা বলে উঠলো মোফাজ্জলের মাঝেই, 'অ্যাই যে শুনতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ পাচ্ছি। একটা সমস্যা হয়ে গেছে।'

'কী?'

'জিন্দান জেনে গেছে আমি কোথায় রয়েছি।'

'বলেন কি!'

'হ্যাঁ, আমি যে ডাটাবেস থেকে তথ্য নিয়েছিলাম, জিন্দান সেই ডাটাবেস অপারেটর পরীকে ঘুষ দিয়ে ইনফরমেশন বের করে ফেলেছে।'

'তাহলে কী আমরা ব্যর্থ?'

'না পুরোপুরি নয়। আমি কোথায় আছি তা জিন্দান জেনে গেছে এটা সত্যি কিন্তু সে তার অনুভুতি শক্তি দিয়ে আমাকে খুঁজে পাচ্ছে না। সে খুঁজে পাচ্ছে আপনাকে। আর আপনার অবস্থান নির্ধারণ করে সে এখানে চলে আসবে।'

'আপনি তা হলে পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যান।'

'সেটা সম্ভব নয়। আমি আপনার মধ্য থেকে বের হলেই জিন্দান তার অনুভুতি শক্তি ব্যবহার করে আমাকে ধরে ফেলবে।'

‘জিন্দান এখানে আসুক। আসলেই তো সে আর আপনাকে খুঁজে পাচ্ছে না।’

‘কিন্তু জিন্দান জানে আমি আপনার মাঝে আছি। সে আমাকে ঠিকই বের করে ফেলবে। প্রথমে হুমকি দেবে বের হবার জন্য। যদি রাজি না হই তা হলে আপনাকে মেরে ফেলবে। আর আপনি মারা গেলে আমি চাইলেও আর আপনার মধ্যে থাকতে পারবো না।’

‘জিন্দান কী কোনো ভয়ংকর অস্ত্র নিয়ে আসবে? তাকে কোনভাবে দেরি করিয়ে দেয় যায় না?’

‘না, সে অস্ত্র নিয়ে আসবে না। সে আসবে আপনার স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। আপনি পারবেন না আমাকে রক্ষা করতে?’

মোফাজ্জল একটু চুপ করে থেকে বললো, ‘পারব।’

পাঁচ

বিশাল এক রুক্ষ প্রান্তর। প্রান্তরের ঘাসগুলো বিবর্ণ হয়ে কেমন যেন এক অশুভ রূপ ধারণ করেছে। যতদূর চোখ যায় শুধু বিবর্ণ ঘাস। যেন এর বাহিরে আর কোন জগত নেই। আকাশের রঙ পুরোপুরি লালচে। যেন রক্তের মাঝে খানিকটা পানি ঢেলে দেয়া হয়েছে। কোথাও জমাট গাঢ় লাল আবার কোথাও খানিকটা ফ্যাকাশে।

প্রান্তরের একপাশে বিশাল এক দুর্গের মতো একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। দুর্গের আশেপাশে আর কিছু নেই। গাছপালা, পাখি, মেঘ কোন কিছুই না। বিবর্ণ ঘাসের এই লালচে জগতে শুধু ওই দুর্গের রঙটাই গাঢ় কালো।

এক সময় দমকা গরম বাতাসের ধাক্কায় পেছন ফিরে তাকাল মোফাজ্জল। তাকিয়েই দেখতে পেল দাঁড়িয়ে আছে অমানুষিক চেহারার কেউ একজন। ত্রিকোণ হলুদাভ চোখ, ক্ষতবিক্ষত ঠোঁট, জটা ধরা চুল আর চ্যাপ্টা মাথাই বলে দিচ্ছে– এর পরিচয় মানুষ হতে পারে না। দমকা গরম বাতাসে বিশাল লম্বা জটা ধরা চুল না বলে আঁশ বলাই ভালো– সেটা আবার ক্রমশ এপাশ ওপাশ করছে। এই অশুভ অস্তিত্বের সাথে আগে কখনও দেখা না হলেও মোফাজ্জল ঠিকই বুঝতে পারলো– এ সেই জিন্দান পরী।

মোফাজ্জল ভালো করেই জানে এখানে যা ঘটছে তা সবই স্বপ্ন। পরী বলেছে, জিন্দান আসবে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। তবে সাধারণ স্বপ্নের সাথে এখানে পার্থক্য রয়েছে। স্বপ্ন দেখলে সাধারণত কেউ একা একা দেখে। কিন্তু এখানে স্বপ্নটা দেখছে তিনজন। পরী, সে ও জিন্দান। তিনজনের স্বপ্নকে এখানে কেন্দ্রীভূত করে এই জগতটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই তিনজনের মধ্যে পরী যেহেতু অস্তিত্বহীন তাই সে কোনো রূপকের আড়ালে তার অস্তিত্বকে প্রকাশ করবে। সম্ভবত ওই কালো দুর্গটাই পরী।

জিন্দানের কাজ হবে মোফাজ্জলকে হত্যা করে ওই কালো দুর্গটার দখল নেওয়া। জিন্দান অনেক ক্ষমতাবান পরী– এটা সত্যি। বাস্তবে জিন্দানের সামনে দাঁড়ানোর কোন যোগ্যতাই মোফাজ্জলের নেই। কিন্তু এই স্বপ্নজগতে জিন্দান একাই ক্ষমতাবান নয়। স্বপ্নে চাইলেই অনেক কিছু করা সম্ভব। স্বপ্ন মানেই কল্পনা। আর এই কল্পনা শক্তিই এই জগতে জিন্দানের সাথে লড়াই করার একমাত্র উপায়।

এই জগতে জিন্দান, মোফাজ্জল, পরী প্রত্যেকেই নিজের স্বপ্ন দেখছে। তাই যেটা বাস্তবে সম্ভব হয় না সেটা এখানে কল্পনা করে অনেক কিছুই করা যেতে পারে। যেমন স্বপ্নে যে কেউ ভাবতে পারে সে আকাশে উড়ছে। ঠিক তেমনি কল্পনা আর ভাবনাগুলোকে দ্রুত কাজে লাগিয়েও জিন্দানকে আটকে দেয়া সম্ভব।

স্বপ্নের জগতে অনেক কিছু হতে পারে। সম্ভবত জিন্দান যে রূপটি নিয়ে মোফাজ্জলের সামনে এসেছে সেটি তার কাল্পনিক রূপ। প্রথম দর্শনেই ওকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যই জিন্দান এই রূপ ধারণ করেছে।

খুব বেশি সময় নিল না জিন্দান। মোফাজ্জল ঘুরে দাঁড়াতেই সোজা উপরে লাফ দিয়ে ওর গলা বরাবর ডান পা সামনে বাড়িয়ে দিল। পায়ের আঙুলগুলো থেকে মুহূর্তেই ধারালো লম্বা নখ স্যাঁত করে বেড়িয়ে এল– যেন মোফাজ্জলের কণ্ঠনালী এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে।

মোফাজ্জলও তার ডান পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করে শূন্যে ভেসে পেছন দিকে সরে আসতে আসতে একটা ধারালো ব্লেড দিয়ে জিন্দানের নখগুলোকে কেটে প্রায় সমান্তরাল করে দিল। চাইলেই কল্পনা করে নিজের হাতে যে কোনো অস্ত্র নিয়ে আসা যায় এই কল্পলোকে নিমিষেই। মোফাজ্জল মাটিতে পা রাখার আগেই হাতের ব্লেডকে ঘুরিয়ে জিন্দানের মুখ বরাবর সরাসরি ছুঁড়ে দিল।

জিন্দান চট করে একপাশে সরে যাওয়ায় ব্লেডটা একটুর জন্য ওর বাম কানটাকে মিস করলো। তবে বনবন করে ঘুরতে থাকা ধারালো ব্লেড তার মাথার পেছনে ঝুলে থাকা দুটো চুলের জটার একটাকে দু'টুকরো করে দিল। এক জটা হারিয়ে জিন্দানের মুখটা যেন আরো খানিকটা বিকৃত রূপ ধারণ করলো।

কাটা পরা চুলের জটা মাটিতে পরার আগেই জিন্দান কোথেকে এক ইলেকট্রিক পোলের মতো ভারী এক বিশাল রড ঘুরিয়ে দিল মোফাজ্জলের দিকে। প্রথম আঘাতটা মোফাজ্জল কোনভাবে এড়িয়ে গেলেও সেটা ঘুরিয়ে যখন জিন্দান দ্বিতীয় আঘাত করে বসলো– সেটা আর এড়িয়ে যেতে পারলো না। শক্ত ইলেকট্রিক পোলের আঘাতে উড়ে গিয়ে খানিক দূরে গড়িয়ে পড়ে গেল মোফাজ্জল। বিবর্ণ ধারাল ঘাসে পড়ে গিয়ে হাত-পা ছিলে গিয়ে জ্বালা করতে লাগলো। কোনমতে উঠে দাঁড়াতেই এক ঝাঁক ছোট ছোট ছোরা সাঁই-সাঁই করে ধেয়ে আসতে লাগলো তার দিকে।

কল্পনায় বড় একটা ঢাল তুলে নিয়ে সেগুলো ঠেকিয়ে দিলেও প্রথমদিকে ছুটে আসা একটা ছোরা বাম হাতের বাহুতে গেঁথে গিয়েছিল আগেই। প্রথমদিকে ঢালটা ভালোই কাজ করছিল কিন্তু খানিক পরেই কীসের আঘাতে যেন ঢালটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে এক ধাক্কায় মোফাজ্জলকে আবারও দূরে কোথাও ছিটকে ফেলে দিল।

এবার পরে গিয়ে মোফাজ্জলের মনে হলো শরীরের সমস্ত হাড় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াবার মতো শক্তিটুকুও হারিয়ে গেছে। মাথাটা ঘুরিয়ে উপরের দিকে তুলতেই ও দেখতে পেল জিন্দান বিশাল একটা গদা নিয়ে মোফাজ্জলের মাথাটা গুঁড়োগুঁড়ো করে দেবার চিন্তা করছে। চট করে তখন হাতের বাহুতে গেঁথে থাকা ছোরাটা টেনে বের করে কোনভাবে জিন্দানের দিকে ছুঁড়ে দিল ও। ছোরাটা লাফ দিয়ে গিয়ে থ্যাঁচ করে বুক বরাবর বিঁধে গেলেও ওটাকে মোটেও পাত্তা দিল না জিন্দান। আগের মতোই এগিয়ে আসতে লাগলো।

কী কারণে যেন তখন মোফাজ্জলের মনে পড়লো, ছোটবেলায় বড়দের অনেকবার বলতে শুনেছে– আগুন দেখলে অশুভ কিছু দূরে সরে যায়। মুমূর্তেই মোফাজ্জল মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা ছড়িয়ে দিল জিন্দানের দিকে। আগুনের ধাক্কায় নাকি উত্তাপের ভয়ে ঠিক বোঝা গেল না, জিন্দান হাতের গদাটা ফেলে দিয়ে পিছু হটে গেল।

জিন্দান এভাবে চলে যাওয়ায় মনের মাঝে খানিকটা আত্মবিশ্বাস যেন ফিরে পেল মোফাজ্জল। কোন রকমে হাটুর উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই চারাপাশে শুকনো কাঠের স্তূপ দিয়ে ব্যারিকেড দিয়ে তাতে মুহূর্তেই আগুন ধরিয়ে দিল। লকলকে আগুনের শিখায় আর ধোঁয়ার ওপাশে জিন্দানকে দেখা গেল না।

মোফাজ্জল কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করলো দুর্গের দিকে। একদম সময় নেই হাতে। কাজ শেষ করতে হবে। দুর্গটা অনেকটা পিরামিডের মতো দেখতে। দুর্গের তিনপাশে তিনটা দরজা থাকার কথা। দরজার উপরে চাবি ঝোলানো আছে। ওর কাজ হচ্ছে দরজার তালাগুলো খুলে দেওয়া। প্রথম দুটো দরজার কি হোলে চাবি রাখতেই দরজাগুলো খুলে গেল। দরজাগুলো অদ্ভুত রকমের। পাশ থেকে নয়, অনেকটা ঢাকনার মতো উপর দিকে খুলে আসে। কি-হোলে চাবি ঘোরানোর প্রয়োজন হচ্ছে না। প্রথম দুটো দরজা কোন সমস্যা ছাড়াই খুলে ফেললো মোফাজ্জল। এরপর দৌড়ে দুর্গের শেষ দরজার কাছে পৌছে উপরে ঝোলানো চাবিটা হাতে নিতেই পেছন থেকে ভারী কোন কাঠের পাটাতনের বাড়ি খেয়ে মাটিয়ে পড়ে গেল ও। দুনিয়াটা যেন মুহূর্তেই অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। এ সময় মাটিতে পড়ে থাকা গলফ বলের মতো কোন গলফ স্টিকের আঘাতে ছিটকে উড়ে গিয়ে আবারও মাটিতে আছড়ে পরলো মোফাজ্জল। মাটিতে পরে কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান ছিল না ওর। জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুলেই দেখতে পেল এতকিছুর পরেও ওর হাতে চাবিটা রয়ে গেছে।

জিন্দানের যে ক্ষমতা ও শক্তি তাতে করে শেষ দরজাটা এই মুহূর্তে খুলতে না পারলে আর কখনোই যে ও আর সেটা খুলতে পারবে না– তা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছিল মোফাজ্জল। যে দরজাগুলো খোলা হয়েছিল জিন্দান এখন সেগুলো বন্ধ করে দেবার জন্য ওদিকে এগুচ্ছে। ওকে না থামাতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর বিন্দুমাত্র ক্ষমতা যার নেই সে আর কিভাবে জিন্দানের মতো ভয়ংকর অস্তিত্বকে বাধা দেবে!

তবু শেষ চেষ্টা হিসাবে হাতে চট করে একটা কাল্পনিক স্নাইপার রাইফেল নিয়ে এল ও। যে রাইফেল দিয়ে বুলেট নয়, তীর ছুটবে। কোনোমতে তীরের মাথায় চাবিটা সোজা করে গেঁথে দিয়ে নিশানা তাক করে ট্রিগার চেপে দিল। কিন্তু মনে হয় দেরি হয়ে গেছে। ব্যাপারটা জিন্দানের চোখে পরে গেছে। তীরটাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেবার জন্য উল্টোদিকে ঘুরে লাফ দিয়ে বসলো জিন্দান। শেষ মুহূর্তে তীরটাকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললো জিন্দান। কিন্তু ততক্ষণে কি-হোলে চাবিটা ঢুকে গেছে। জিন্দানের হাতের ধাক্কায় চাবি থেকে তীরের জয়েন্টটা ছুটে গেল ঠিকই। কিন্তু চাবিটা কি-হোলে রয়ে গেছে। ভাঙা তীর নিয়ে হতবুদ্ধির মতো বসে রইলো জিন্দান। আর ওদিকে ঘর্‌ঘর্‌ শব্দে একটু পর তৃতীয় দরজাটাও খুলে গিয়ে উপরের দিকে উঠে গেল।

মোফাজ্জল আর মাথা তুলে রাখতে পারল না। ঝপ করে নেমে গেল মাটিতে। তৃতীয় দরজাটা খুলে যাবার পর যেন ধুলোর আস্তরণের এক বিশাল ঘুরপাক সৃষ্টি হলো দুর্গটাকে ঘিরে আর তার সাথে সাথেই মোফাজ্জলের সামনে নিকষ আঁধারেরা সব দল বেঁধে নেমে এল।

ছয়

চোখ খোলার পর মোফাজ্জল দেখলো তার পায়ের কাছে পরী বসে আছে। মোফাজ্জল দুর্বল গলায় বলার চেষ্টা করলো, 'জিন্দান কোথায়?'

পরী হেসে বলল, 'সে আপাতত পৌনে দুইশো বছরের জন্য তার দুঃস্বপ্নের মাঝে আটকা পড়ে গেছে। অভিনন্দন আপনাকে– আমাকে রক্ষা করার জন্য। মানুষ যেখানে মানুষের জন্য কিছু করে না সেখানে মানুষ হয়ে পরীর জন্য যা করলেন–'

মোফাজ্জল একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, 'করেছি, সে তো নিজেকে বাঁচানোর জন্য। আপনি তো জিন্দানের গলায় মালা দিয়ে সুখে ঘরকন্না করতেন। আমি মারা গেলে খুব বেশি সমস্যা হত না।'

পরী চোখ মটকে বলল, 'হয়েছে, আপনাকে আর বলতে হবে না, যথেষ্ট বলেছেন। এখন আপনাকে কিছু কথা বলি, মন দিয়ে শুনুন। আমাকে আজকেই চলে যেতে হচ্ছে। কিছু জরুরি কাজ পড়ে আছে। সবার আগে অবশ্য ডাটাবেস অপারেটর পরীটাকে শায়েস্তা করতে হবে। সম্ভবত চাকরিটা চলে যাবে ওর। তারপরেও ওর ব্যক্তিগত শাস্তির ব্যবস্থা করবো আমি। আর আপনি আমাকে যেভাবে রক্ষা করেছেন তাতে করে আমার কাছ থেকে অনেক কিছুই পাওনা হয়ে গেছে আপনার । সেটা অবশ্যই মিটিয়ে দেবার জন্য ফিরে আসবো আমি।'

'ওহ্! শুনুন, আপনার শরীরের যথেষ্ট যত্ন নিয়েছি আমি। একটু জ্বর থাকতে পারে। তবে সেটা আজকেই ভাল হয়ে যাবে। এবার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেই, বাড়িওয়ালীর বড় মেয়ে ঊর্মি খুব পছন্দ করে আপনাকে। খুব পছন্দ বললেও খানিকটা কমিয়ে বলা হবে। সে প্রচণ্ড রকমের ভালোবাসে আপনাকে, আপনি জানেন?'

মোফাজ্জল মাথা নেড়ে বলল, 'সম্ভবত জানি, কিন্তু–'

পরী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'না, কোনো কিন্তু নেই। আমি চলে যাবার পরপরই ঊর্মি এখানে আসবে এবং আপনার কে অসুস্থ দেখে আপনার যত্ন-আত্তি শুরু করে দেবে। দয়া করে আপনি তাতে কোনো বাধা দেবেন না। আপনাদের দুজনের খুব চমৎকার একটি সংসার হবে– আমি জানি। আজ তবে আসি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। ভালো থাকবেন।'

'পরী একটু শুনুন।'

'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'আপনি এতদিন আমার এখানে ছিলেন অথচ আপনার নামটা কখনও বলেননি।'

'আমার নাম তো আপনি জানেন।'

'আমি জানি! কই! কী নাম?'

'ঊর্মি। আমার নাম– ঊর্মি।'

'মানে!!'

পরী আর কোন জবাব না দিয়ে মোফাজ্জলের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে দরজাটা চাপিয়ে দিয়ে চলে যায়। এর একটু পরেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ঊর্মি। ভেতরে এসে মোফাজ্জলকে ড্রইংরুমের বিছানায় কাঁথা গায়ে শুয়ে থাকতে দেখে ছুটে আসে এদিকে।

মোফাজ্জলের কপালে হাত রেখেই আঁতকে উঠে ঊর্মি, 'ইস্, গায়ে তো অনেক জ্বর। এক্ষুনি পানি দিতে হবে।'

ঊর্মি পানি আনতে ভেতরে চলে যায়। মোফাজ্জল নিষেধ করবে ভেবেও কিছু বলতে পারে না। তার মাথায় হঠাৎ আরেকটা চিন্তা খেলে যায়– আচ্ছা, ঊর্মির চেহারার সাথে পরীর চেহারার এত মিল কেন?
আগে তো কখনো খেয়ালে আসেনি। ওফ্! জ্বরের ঘোরে বোধহয় একই রকম লাগছে। এসব ভাবতে ভাবতেই চোখ বুজে আসে তার।

লেখক পরিচিতি

এজি মাহমুদ
আলসেমি আর তুমুল আড্ডাবাজি তার ভীষণ কাছের দুই বন্ধু। আবার কখনও কখনও সব ফেলে রেখে একের পর এক বইয়ের পাতা উল্টে যেতে থাকেন। কোনো কিছু একবার শুরু করলে শেষ না দেখে স্বস্তি হয় না তার।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন না ঘুরে বেড়াচ্ছেন সে বিষয়ে তিনি নিজেই বেশ সন্দিহান। খানিকটা এলোমেলো জীবনযাপনে অভ্যস্ত হলেও কোনো অগোছালো কাজ তার সহ্য হয় না একেবারেই।

কিছুদিন আগে শর্ট ফিল্ম নিয়েও কাজ করেছেন। ভবিষ্যতে বিগ বাজেটের ফিল্ম মেকিংয়ের পোকারাও ঘুরঘুর করে তার মাথায়। একসঙ্গে অনেকগুলো জাতীয় দৈনিকে লিখেছেন একসময়। এখন স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করছেন পাক্ষিক একপক্ষে।

নিউজ কিংবা ফিচার লেখার চেয়ে কল্পনার দৌড়ে গল্প লিখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। লেখালেখির শুরুটা শখের বসেই। তবে শেষটা কিভাবে হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন এখনও।

Phone # 0191-1190179 / 0171-9487577
E-Mail: ag_amo@yahoo.com